অভিনেতা

অভিনেতা

শ্রীআর্য্যকুমার সেন



রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

চৈত্র ১৩৪৭

মূল্য—দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫'২—৩.৪.৪১

সুলেখাকে

সূচী

অঙ্গার

টুণ্ডলা স্টেশনে আগ্রাগামী গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া আছি। তাজমহল দেখিতে যাইব। সহসা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একটি মেয়ের মুখ চোখে পড়িল। খুব অপরিচিত বোধ হইল না।

এক-একটি লোককে দেখিয়া মনে হয়, যেন আগে কোথাও দেখিয়াছি, অথচ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না। মনে হইল, ইহাকেও যেন কোথায় দেখিয়াছি, একটু চিন্তা করিলেই মনে পড়িবে।

মেয়েটির বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশ হইবে। দেখিতে সুন্দরী, যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়াও রূপের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সঙ্গের পুরুষটিকেও অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতে লাগিল, যদিও ছেলেমেয়ে তিনটিকে চিনিয়া উঠিতে পারিলাম না। পারার কথাও নয়। কারণ নিঃসন্দেহ ইহাদের দেখিয়াছি অনেক দিন আগে, যখন ছেলেমেয়ে তিনটির জন্ম হয় নাই।

অবশ্য মুখ চেনা হইলেও ইহারা যে পরিচিতই, এমন নাও হইতে পারে। কলিকাতার পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, সিনেমায়—

এইবার যেন বিস্মৃতির মধ্যে একটু আলো দেখিতে পাইলাম। সিনেমাতেই বটে। চৌরঙ্গীতে, ইহারা দুইজনেই একসঙ্গে ছিল; অন্তত দশ-এগারো বছর আগের কথা।

অভিনেতা

ধীরে ধীরে সবটাই মনে পড়িল। মনে পড়িবার ফলে আর সে কামরায় চড়িবার প্রবৃত্তি রহিল না। পাশে আর একখানিতে উঠিলাম।

দশ-এগারো বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন বছর সাতাশ। সাত মাস কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া মাসখানেকের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছি।

সিনেমা দেখার অভিপ্রায় লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। এ সাত মাস যেখানে কাটাইয়াছি, সেখানে লোকে সিনেমার নামও শোনে নাই, দুই-একজন ছাড়া। তাহারা আমারই মত অর্থের চেষ্টায় মধ্যপ্রদেশের এক করদ-রাজ্যে পাহাড়ের ধারে জঙ্গল কাটাইয়া মাটির ভিতর খুঁড়িয়া দেখিতেছে, কয়লা মেলে কি না। নিজেদের জন্য নয়, বিত্তশালী মনিবের জন্য।

টিকেট-ঘরের পাশে জ্ঞানেন্দুর সহিত দেখা হইল। পাঁচ বছর আগে একই সঙ্গে এম. এস-সি. পাস করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। আমি যা হোক একটা কিছু চাকরি পাইয়াছিলাম, সে বেচারা এখনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

একই সঙ্গে সিনেমায় ঢুকিলাম। আলো নিবিবার মিনিট কয়েক আগে সহসা দুই-তিন সারি সামনে একটি মেয়ের মুখ চোখে পড়িল, সুন্দরী, বছর কুড়ি-একুশ বয়স। সঙ্গে একটি সুশ্রী সুবেশ যুবক।

পরিচিত মনে হওয়ায় কয়েক মুহূর্ত্ত সেদিকে তাকাইয়া ছিলাম। জ্ঞানেন্দু হাসিয়া বলিল, চিনেছ দেখছি।

বলিলাম, ঠিক চিনি নি, চিনি-চিনি করছি।

ওর নাম মৃণাল।

মৃণাল? ওঃ, এইবার চিনেছি। বিয়ে হয়ে গেছে দেখছি। মাঝ থেকে দিলীপ বেচারার মনঃকষ্ট। দাদার জেদই বজায় রইল।

জ্ঞানেন্দু আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া কহিল, তুমি তো অনেক দিন বাইরে ছিলে, সব খবর জান?

বলিলাম, জানার যা কিছু, মোটামুটি সবই জানি। দিলীপের মধ্যে যে এতবড় দেবদাস লুকিয়ে ছিল, সেইটেই আগে জানতাম না। কেমন আছে সে? বেঁচে, না সায়ানাইড, না বাহ্‌রিন আইল্যাণ্ড্‌স?

অনেকটা ঠাট্টার ছলেই কথা কয়টা বলিলাম, যদিও নিজেও জানিতাম, জিনিসটা দিলীপের দিক দিয়া পুরাপুরি হাসির নহে। সম্ভবত সামনের ঐ মেয়েটির দিক দিয়াও নহে।

জ্ঞানেন্দু উত্তর দিল একটু পরে। কহিল, না। সায়ানাইড খাওয়ার অবস্থা দিন-কয়েক দাঁড়িয়েছিল, তবে তারপরে—

ঠিক এমনই সময়েই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং চোখের সামনে একটি কৃষ্ণবর্ণ ইঁদুর যে অভিনয় করিয়া চলিল, তাহার সহিত আমার একটি বন্ধুর জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই।

তখন এম. এস-সি. পাস করিয়া রাজা-উজির হওয়ার স্বপ্ন ছাড়িয়া ডাল-ভাতের চেষ্টায় মন দিয়াছি। ডাল-ভাতের যোগাড় হইলেও, ভদ্র-ভাবে সভ্যসমাজে মিশিবার মত টাকা তখনও রোজগার করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে সময়ে দিলীপ সগর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীতে এম. এস-সি. ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ল পাস করিয়া ওকালতির চেষ্টা দেখিতেছে।

দিলীপ চিরকালই সুপুরুষ। রং বাঙালী ছেলের পক্ষে অত্যন্ত ফরসা, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। মেয়েরা যে তাহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত কৌতূহলী, সে কথাটাও মধ্যে মধ্যে জানাইয়া দেয়—সত্য মিথ্যা এবং

অর্দ্ধসত্য সম্বলিত কতকগুলি গল্প করিয়া। মোটের উপর দিলীপ যে চালিয়াৎ, সে বিষয়ে বন্ধুমহলে মতভেদ ছিল না, তবে তাহার রচিত আজগুবি গল্পের মধ্যে যে খানিকটা সত্য হওয়া সম্ভব, সে কথাও কেহ অস্বীকার করিত না। বন্ধুমহলে তাহার খাতিরও ছিল না, অসম্মানও ছিল না।

এই দিলীপই যখন চুপিচুপি আমাকে জানাইল যে, সে অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া গিয়াছে, এবং বিপদটা ঠিক আধিভৌতিক নহে, তখন কৌতুহল হইল বেশ একটু। ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে বলিলাম।

দিলীপের দাদা কলিকাতার কাছাকাছি একটি ছোট শহরের একটি ততোধিক ছোট উকিল। তিনি যে আয় করিতেন, তাহা দিয়া স্ত্রীর, ভ্রাতার, এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে খ'ড়ো ঘর ছাড়া উপায় ছিল না। তবে পিতৃদত্ত সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার অঙ্ক বেশ একটু মোটা, এবং সেইজন্যই আদালত ও বাড়ির মধ্যের রাস্তাটা গাড়ি করিয়া বেড়ানো ছাড়া আর কোন লাভ না হইলেও উকিলবাবুর কোন অসুবিধা হয় নাই।

আমরা যে বারে বি. এস্-সি. পাস করিলাম, সেই বারই দিলীপের দাদা বিবাহ করিলেন এবং সেই বিবাহের ফলেই বিবাহের বছর-চারেক পরে দিলীপের জীবনে চরম সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইল।

কারণ অবশ্য ইহা নহে যে, দিলীপের বউদি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ এবং দেবরবিদ্বেষী। দিলীপ নিজেই আমাদের কাছে বলিয়াছে, বউদি তাহাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখেন। অবশ্য দিলীপের বউদি দিলীপের অপেক্ষা বয়সে ছোট।

এমনই সময়ে একদিন চুপিচুপি দিলীপ জানাইল যে, বউদির দুই বোনকেই সে একসঙ্গে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারাও যে তাহার

সম্বন্ধে একটুও সচেতন নয়, তাহা নহে। মোটের উপর বড়টি, অর্থাৎ মৃণালই বেশি সুন্দরী, এবং তাহাকে বিবাহ করিতে দিলীপের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।

কথাটা আগাগোড়া বিশ্বাস করিলাম না, কেন না এসব বিষয়ে লোকের কথা বিশ্বাস করার বয়স তখন পার হইয়া আসিয়াছি। তবু বলিলাম, ভাল কথাই তো। ক'রে ফেল বিয়ে, নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে। তবে তুমি চাওয়ামাত্রই যে মেয়ে এবং মেয়ের বাপ রাজি হয়ে যাবে, তার স্থিরতা কি?

সে খানিকক্ষণ অবাকবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করি নি। কারণ আমার সম্বন্ধে তোমার অবিশ্বাসের ভাব আমি জানি। তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি, আজ যদি এখনই গিয়ে মৃণালকে বলি, মৃণাল, আমাকে বিয়ে কর, ও রাজি হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত্তেই। নিজের ওপর এটুকু বিশ্বাস আমার আছে।

বুঝিলাম, রাগ করিয়াছে। ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, ভুল করছ, আমি সে কথা বলি নি।

তবে কোন্ কথা বলেছ?

অনেক কথা। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের কথা তো জান। শুধু তোমার, আর মৃণালের মত হ'লেই বিয়ে হবে না, মৃণালের মা-বাবার মত চাই, তোমার দাদা-বউদির মত চাই—

সে বাধা দিয়া কহিল, মৃণালের মা-বাবার অমতের কোন কারণ নেই। আমার বংশ ভাল, চরিত্র ভাল, নিজে রোজগার না করলেও বাবা যা রেখে গেছেন, তার ওপর দিয়েই একটা জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। আর দাদা-বউদি? বউদির অমত কিছুতেই হবে না, তবে

দাদার কথা বলা অবশ্য শক্ত। তবে এমনি তো অমতের কোন কারণ দেখি না।

কারণ কিছু থাক বা না থাক, দাদা অমত করিলেন। এক বাড়িতে দুই ভাইয়ের বিবাহ নাকি কোন রকমেই চলিতে পারে না, পৃথিবী উল্টাইয়া গেলেও না। অবশ্য এ ধরনের বিবাহ যে হয় না, তাহা নহে; কিন্তু ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ হয়। তাহা ছাড়া মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে দিলীপের মাথায় বিবাহের চিন্তা ঢোকা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, এবং বাড়াবাড়ি দেখিলে তিনি এ রোগের চিকিৎসা নিজের হাতে গ্রহণ করিবেন।

মৃণালের বাবার কোন অমত ছিল না, মৃণালের তো ছিলই না। বউদি ছোট বোনকে জা হিসাবে পাওয়ার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্বামীর আপত্তিতে মর্ম্মাহত হইলেন। অনেক অশ্রু, অনেক উপবাস, অনেক মান-অভিমান চলিল, মতের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

অথচ আপত্তির কারণ সম্ভবত কোন দিক দিয়াই ছিল না। ছোট ভাইয়ের সহিত তাঁহার বয়সের এমন কোন তফাত ছিল না, যে দিক দিয়া তিনি শাসকের পদ লইতে পারেন। দিলীপ উপার্জ্জন করিতে শিখে নাই, এ কথাও অচল; কারণ উপার্জ্জন করিতে তিনিও শিখেন নাই। পৈতৃক অর্থ তাঁহার একার নহে, তাহাতে দিলীপের সমপরিমাণ ভাগ রহিয়াছে। তথাপি হুকুম টলিল না।

সে সময়ে দিলীপের স্থলে নিজেকে বসাইয়া অনেক কথাই ভাবিয়াছি। আমি হইলে দাদার আপত্তিতে এক বিন্দুও কর্ণপাত করিতাম না, বিশেষ করিয়া যখন অর্থের জন্য দাদার দ্বারস্থ হওয়ার কোন প্রয়োজনই নাই, ইত্যাদি অনেক কথা।

পরে দেখিলাম, মনে যাহা ভাবা যায় এবং কাগজ-কলম হাতের কাছে থাকিলে যাহা লেখা যায়, তাহার সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। এ দিক দিয়া পৃথ্বীরাজ, লকিন্‌ভার প্রভৃতির রীতি বর্ত্তমান সময়ের ভারতবর্ষে তেমন করিয়া খাটে না। এখানে বিবাহের পূর্ব্বে বাপ-মা ছাড়া আরও অনেকগুলি লোকের মত উভয় পক্ষে লইতে হয়,—যথা মাতামহ, পিসীমা প্রভৃতি। এসব দিক না দেখিয়া আগুন লইয়া খেলা করিতে যাওয়া বুদ্ধিহীনতা, এবং পরিণামে পরিতাপ করিবার পূর্ব্বাভাস মাত্র।

দিলীপের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা গেল, দাদার সম্পূর্ণ অমতে বিবাহ করার সাহস দিলীপের বেশি নাই। দ্বিতীয়ত জামাতার অমতে তাহারই ছোট ভাইয়ের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে মেয়ের বাপের আপত্তি এবং ইহা হইতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে মেয়েরও বিবাহে আপত্তি। দোষ দিবার মত কারণ তখন যথেষ্ট পাইয়াছিলাম, এখন আর পাই না; কারণ মনে হয়, মৃণাল অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ের মত কাজ করিয়াছিল। তবে যেখানে হৃদয় মস্তিষ্কের কাছে পরাভূত, সেখানে মস্তিষ্কের বাস্তব-দর্শিতার সুখ্যাতি করিলেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু অতৃপ্তি রহিয়া যায়; মনে হয়, বাস্তবকে এত বড় করিয়া না দেখিলেও বোধ হয় চলিত।

আদালতে দিলীপের মক্কেলের অস্তিত্ব ছিল না, তবু সে সাদা প্যাণ্ট, কালো কোট ও টাই পরিয়া আদালতে গিয়া তুপুরটা সিগারেট খাইয়া উড়াইয়া দিত। এখন কিছু দিন আদালতে যাওয়া বন্ধ করিল।

যাহাদের বুকে জোর নাই, তাহাদের কোন কিছু করিতে যাওয়াই বোকামি। দিলীপ যদি আর দশজন সহপাঠী ও সহকর্ম্মীর মত, অর্থাৎ সুবোধ শিশুর মত, খাওয়া ঘুম ও আদালতে সিগারেট খাওয়া লইয়া

অক্লেশে সময় কাটাইতে পারিত এবং যথাসময়ে দাদার পছন্দমত একটি কিশোরী বধূ ঘরে আনিতে পারিত, তাহা হইলে আপত্তির কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু সহসা যখন একটি মেয়ে চোখে নেশা ধরাইয়াই দিল, তখন খানিকটা হৈচৈ করিয়া, সায়ানাইডের ভয় দেখাইয়া বন্ধুমহলে সোরগোল তুলিয়া লুপ্তবায়ু সোডার বোতলের মত নির্জ্জীব হইয়া গেল কেন? আমার আপত্তি এইখানেই; শুধু আমার নহে, জ্ঞানেন্দু, নৃপেন, কালীপদ প্রভৃতি সহপাঠীদেরও আপত্তি। খানিকটা সায়ানাইড খাইয়া এক মুহূর্ত্তে প্রাণটাকে অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইবার পক্ষপাতী আমরা কেহই নই, কিন্তু এতখানি ঝড়-তুফানের পরে এতটা শিষ্ট মূর্ত্তি আরও আপত্তিকর।

মোট কথা, দিলীপ আমাদের নিরাশ করিল। আমাদের তখন যে বয়স, তাহাতে স্থিরচিত্তে চারিদিক ভাবিয়া বিচার করিয়া রায় প্রদান করা সম্ভব নহে, উত্তেজনার বিষয়ই তখন আমাদের খোরাক। চোখের সামনে মানুষ মোটর-চাপা পড়িলে দুঃখিত হই, তবু চিত্তের গভীরতম অঞ্চলে এই খুশিটুকু জাগিয়া উঠে যে, দিন-দুই ধরিয়া লোকের কাছে একটা গল্প করার মত বিষয় পাওয়া গেল। এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা পাই, যেমন লজ্জা পাই মনের বহু দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে। কিন্তু প্রকাশ করিতে লজ্জা হয় বলিয়াই কথাটা মিথ্যা নহে।

দিলীপকে চালিয়াৎ বলিয়াই জানিতাম। চালিয়াৎ বলিয়া যে পরিষ্কার চিনিতে পারিয়াছিলাম, তাহার প্রধানতম কারণ আমরা সকলেই অল্পবিস্তর চালিয়াৎ ছিলাম। সেই চালিয়াৎ দিলীপের জীবনেই যখন একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল, যেটা নিজের কাছে তখনও অপরিচিত এবং কতকটা অবিশ্বাস্য, তখন একটা উত্তেজনার বিষয় পাইয়া খুশি হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে দিলীপকে যে উচ্চাসনে বসাইয়াছিলাম,

সেখান হইতে ভূপতিত হইতে তাহার এক মুহূর্ত্তের বেশি সময় লাগিল না।

একদিন তিন-চারজন বন্ধুর সামনেই বলিলাম, যাক, এইবার সুবোধ ছেলের মত দাদার কথামত একটা বিয়ে ক'রে ফেল; অবশ্য দাদা যদি তোমার বিয়েটাকেই আপত্তিকর ব'লে ধরেন, তা হ'লে বিপদ।

সকলে হো হো করিয়া হাসিলাম। খুব উচ্চশ্রেণীর রসিকতা হইল বলিয়া নহে, দিলীপকে একটু আহত করার উত্তেজনা পাওয়া গেল বলিয়া। এ প্রবৃত্তি আমাদের দোষ নহে, বয়সের।

আশ্চর্য্য কথা, দিলীপ নিজেও হাসিল—সম্ভবত অপ্রস্তুত ভাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। কিন্তু দিলীপের হাসি দেখিয়া আমাদের হাসিটা থামিয়া গেল।

জ্ঞানেন্দু বয়সে আমাদের মধ্যে সামান্য একটু বড়। সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কহিল, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে? দিলীপ কিছু মনে করিস না ভাই, ওটা একটা ইয়ে।

অথচ সে-ই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি হাসিয়াছিল।

ইহার পরে কিছুদিন দিলীপের সঙ্গে দেখা হয় নাই। চাকরির চেষ্টা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। একদিন জ্ঞানেন্দু বাড়ি আসিয়া খবর দিয়া গেল, ব্যাপার যতটা সহজে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহা মোটেই হয় নাই, কারণ দিন-চারেক আগেই দিলীপের সহিত তাহার দাদার তুমুল কলহ হইয়া গিয়াছে এবং বউদি দেবরের পক্ষেই যোগ দিয়াছিলেন।

বলিলাম, ঝগড়াটা যে মৃণালকে নিয়েই, তা কি ক'রে জানলে?

মৃণালকে নিয়েই। মৃণাল ওদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

ছাদের ওপরে সন্ধ্যের সময়ে তুজনে গল্প করছিল, বউদি ছিলেন নীচে। দাদা কোর্ট থেকে ফিরতেই লঙ্কাকাণ্ড।

ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বলিলাম, লঙ্কাকাণ্ডটা কি মৃণালের সামনেই হ'ল, না সেটুকু জ্ঞান তখনও ছিল?

দিলীপের ছিল, দাদার ছিল না। বউদি বুদ্ধি ক'রে তাড়াতাড়ি মৃণালকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন, সে নাকি পাশের ঘরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল।

মৃণালের কথা ভাবিয়া তুঃখ হইল, রাগও হইল। বাঙালী হিন্দুঘরের মেয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কি না করিলেই নয়! এটুকু অবমাননা বোধ হয় তাহার প্রাপ্যই ছিল।

তখন মোটামুটি সকলেই ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছি।

দিলীপের অবস্থা যতই গুরুতর হোক, তাহার তুই বেলা তুই মুঠা ভাতের ভাবনা নাই, আমাদের সে ভাবনাও কিছু পরিমাণে ছিল। নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ানোর চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, যে তুটিকে পা বলিয়া মনে করিতাম, তাহারা শরীরের শোভাবর্দ্ধন করে মাত্র, সোজা হওয়ার ক্ষমতা তাহাদের নাই বলিলেই হয়।

পারস্য-উপসাগরের একটি ছোট দ্বীপের মধ্যে তেলের খনি। সহসা খবর পাইলাম, সেখানে শুদ্ধ ইংরেজীতে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিয়া দিলেই নাকি অবিলম্বে তিন শত টাকা বেতনের চাকুরি হয় এবং তিন বছর চাকরি করিলেই দশ হাজার টাকার একটি নোটের তাড়া হাতে বোম্বাইয়ে অবতরণ করা যায়।

নানা প্রকার উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাও মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশি রোজগার করিতে পারিতেছিলাম না। মনটা প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল।

তিন বছর পরে দেশে ফিরিয়া কি করিব, তাহারও একটা হিসাব মনে মনে হইয়া গেল।

কিন্তু দেখা গেল, দরখাস্ত করার নামেই সকলের আপত্তি। এখনও সাতাশ বৎসর বয়স হয় নাই, এই শিশুকালেই একটা গোটা দেশ, একটা মাঝারিগোছের সমুদ্র, এবং একটা উপসাগর পার হইয়া দূর দেশে যাওয়ার মত সময় আমার হয় নাই।

আমার অদৃষ্টে যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস ছিল না, দেখিলাম, তাঁহাদেরও বিশ্বাস আমি দরখাস্ত করিলেই চাকরি পাইব। বুঝাইলাম, দরখাস্ত শব্দভেদী বাণ নহে, একখানা কাগজ টাইপ করিয়া ডাকে ফেলিয়া দিতে দোষ কি?

এই সহজ সত্যটি তাঁহারা বুঝিলেন না। কিন্তু আমি বুঝিলাম, এবং সম্ভবত নিজের অদৃষ্টের উপর অনাস্থাবশতই দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

একদিন কথায় কথায় কথাটা দিলীপকে বলিয়াছিলাম। খুব বেশি উৎসাহ দেখায় নাই। দেশের মাটির উপর তাহার টান কিঞ্চিৎ উগ্র, শুধু অর্থোপার্জ্জনের খাতিরে বিদেশগমন সে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করে।

যেন সকলেরই পিতৃসঞ্চিত বিপুল অর্থ ব্যাঙ্কের খাতায় আটক হইয়া রহিয়াছে। যেন দেশের ভিজা মাটির সুমিষ্ট গন্ধ গ্রহণ করিয়া দুই বেলা পল্লী-অঞ্চলে কাক ও চড়ুই পাখীর ডাক, এবং কলিকাতায় ট্রাম ও বাসের ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনিলেই পেট ভরিয়া যাইবে।

নানা অপ্রয়োজনীয় কথার মত পারস্য-উপসাগরের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। খবরের কাগজ স্পেন, চীন ও মধ্য-ইউরোপের দুর্য্যোগের কথাতেই বোঝাই, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত ইরানের কথা মনে ছিল না।

মনে একদিন দিলীপই করাইয়া দিল। সন্ধ্যার দিকে একবার

বেড়াইতে বাহির হইব ভাবিতেছি, ঘরে আসিয়া প্রথমেই বলিল, বাহ্‌রিন আইল্যাণ্ডের ঠিকানা দে।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কি হবে?

দরকার আছে।

কার? তোমার নয় নিশ্চয়ই?

সে আমাকে আরও বিস্মিত করিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমারই দরকার।

বলিলাম, তোমার দেশের মাটির কি হ'ল?

সে অসহিষ্ণুভাবে বলিল, দেশের মাটিতে মনের পেট ভরে, কিন্তু ডাল-ভাতের চিন্তা যায় না।

এই কথা কয়টি একদিন আমিই তাহাকে বলিয়াছিলাম। মত-পরিবর্ত্তনটা একটু দ্রুত বলিয়া মনে হইল। বলিলাম, দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? না বউদির সঙ্গে? না মৃণালের—

আমি কথা শেষ না করিতেই সে চটিয়া উঠিল। তাহার মুখ-চোখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, রহস্য অকালে এবং অপাত্রে বর্ষিত হইতেছে। বলিলাম, ঠিকানাটা তো ঠিক মনে নেই, তবে আছে বোধ হয়, খুঁজে দেখি।

কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলাম, আমার অযত্নরক্ষিত ঘরের টেবিলে স্তূপাকার কাগজপত্র ও বইখাতার বোঝার মধ্যে একটি দুই বর্গ-ইঞ্চি পরিমাণ কাগজ খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। অনেকক্ষণ ঘাঁটিয়া সাত-আট বছরের পুরানো একখানি চিঠি পাইলাম, কলেজে পড়ার সময়ের একখানা গ্রাফ-খাতা পাইলাম এবং আরও অনেক কিছুই পাইলাম, যাহাদের আমার টেবিলে অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না এবং তাহাদের একটি জিনিসও দরকারী নহে।

শুধু পাওয়া গেল না একখানি দুই বর্গ-ইঞ্চি পরিমাণ নীল রঙের

কাগজ, যাহার উপর আজ সম্ভবত একটা তুমুল ব্যাপার নির্ভর করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক খুঁজিয়া বলিলাম, নাঃ, কোথাও নেই।

সে বলিল, নেই বললে হবে না, আমার চাই, কয়েক দিনের মধ্যেই।

বলিলাম, আচ্ছা ভূপেনকে জিজ্ঞেস ক'রে নোব এখন।

সে আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু এইখানেই একটু বাধা ছিল। খবরটা ভূপেনের মারফৎই পাইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি সামান্য কারণে ভূপেনের সহিত মনোমালিন্য চলিতেছে, পারতপক্ষে তাহার সঙ্গ এড়াইয়া চলি।

দুই-তিন দিন অন্তর দিলীপ তাড়া দেয়। বলি, ঐ যাঃ, ভুলে গেছি। আচ্ছা, কাল ঠিক—

এমনই করিয়া দিন-পনরো কাটিল। দেখা গেল, তাহার অধ্যবসায় ও আমার বিস্মৃতিপরায়ণতা দুইই প্রায় সমান। তাহার পরে দিন-কয়েক তাহার দেখা পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, আমার বিস্মৃতিই জয়লাভ করিয়াছে।

এই সময়ে বহু স্থানে নিক্ষিপ্ত বহু দরখাস্তের মধ্যে একটি দরখাস্তের উত্তর আসিল, মধ্যপ্রদেশ হইতে।

দেশীয় করদ-রাজ্য। তিনবার তিনখানি রেলগাড়িতে চড়িয়া একটি অখ্যাত স্টেশনে পৌঁছাইয়া মোটরে মাইল ত্রিশ দূরে পাহাড়ের ধারে কয়লার অনুসন্ধান চলিতেছে। আমি ইচ্ছা করিলে মাসিক এক শত টাকার বিনিময়ে অনুসন্ধানে যোগ দিতে পারি।

পারস্য-উপসাগরের নামে যাঁহারা আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা

এবারেও নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। দেশীয় করদ-রাজ্যে নাকি কারণে-অকারণে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়, সেখানে দিনে দুপুরে বাড়ির উঠান দিয়া বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেখানে মাছ মোটেই পাওয়া যায় না, শুধু মুরগীর উপরে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, এবং তরকারির মধ্যে শুধু বড় পেঁয়াজ, টকটকে লাল রঙের।

এত নিরুৎসাহবাণী অগ্রাহ্য করিয়া একদিন বি. এন. আর.-এর বম্বে-মেল ধরিলাম, এবং সাত মাস স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন ভোগ করিলাম। দেখিলাম, এক ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো ছাড়া বাকি মন্তব্যগুলি অনেক অংশেই সত্য। অসুবিধা অনেক ছিল, সকলের চেয়ে বড় অসুবিধা সিনেমার অস্তিত্বহীনতা। তাই সাত মাস পরে কলিকাতায় আসিয়াই সিনেমা দেখিতে আসিয়াছি।

মিকি মাউস, দেশ-বিদেশের খবর, এবং দুই-একটি ছোটখাট ছবি দেখানোর পর ইণ্টার্‌ভ্যালের সময় আসিল। জ্ঞানেন্দুকে বলিলাম, কি বলছিলে? সায়ানাইড খাওয়ার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তবে তারপরে—

জ্ঞানেন্দু একদৃষ্টিতে মৃণালের দিকে তাকাইয়া ছিল। একটা টিপ দিয়া বলিলাম, ওদিকে তাকিয়ে লাভ নেই, যে কথা বলছি তার উত্তর দাও।

সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি কথা?

পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ওঃ, তাই! মানে, হ'ল কি, পরে বেচারা দেখলে, সায়ানাইডে দুঃখ বাড়বে ছাড়া কমবে না, তার চেয়ে ত্রেতাযুগের মত মা-বসুমতী যদি দ্বিধা হ'তে পারতেন, তা হ'লে কাজ দিত।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তত বড় কোন লজ্জা-অপমানের ব্যাপার হয়েছিল নাকি ?

হয় নি ? দিলীপ বেচারা সেন্টিমেণ্টাল হ'লেও চামড়া বোধ হয় একটু মোটা ; আমি হ'লে চীনে ভলাণ্টিয়ার হয়ে চ'লে যেতাম।

ব্যাপারটা কি ?

জ্ঞানেন্দু হাসিল। কথা ঘুরাইয়া বলিল, স্থলেখার খবর কি ?

আমি লাল হইয়া বলিলাম, বাজে কথা ব'কো না। যা বলছি, তার উত্তর দাও, না হয় স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন দেখ।

সে বলিল, বাজে কথা কে বললে, মনে কর, স্থলেখা যদি—

এমনই সময় ঘণ্টা বাজিল, আসল ছবি আরম্ভ হইল। জ্ঞানেন্দুর কথা এবারেও শেষ পর্য্যন্ত শোনা গেল না।

সিনেমা ভাঙিল রাত্রি সাড়ে আটটায়। দরজার কাছেই ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইতে পারিলাম। রাস্তায় নামিবার আগেই জ্ঞানেন্দু বলিল, দাঁড়া।

দাঁড়াইলাম। একটু পরে মৃণাল ও তাহার স্বামী আসিয়া যে গাড়িখানিতে উঠিল, তাহার দাম সম্ভবত আমার ছয় বৎসর বাহ্‌রিন-বাসেরও দেড়গুণ।

গাড়ি চলিয়া গেলে জ্ঞানেন্দু বলিল, বুঝলি কিছু ?

হয়তো বুঝলাম।

সে বলিল, ইণ্টারভ্যালের সময় যা বলছিলাম ?

কোথা হইতে কেমন করিয়া যে জ্ঞানেন্দু পুরানো কথার খেই খুঁজিয়া পায়, সেই জানে। বলিলাম, কি আবার বলছিলে ?

তোমার আপত্তি আছে ? তা হ'লে মৃণালের কথাই বলি। দিলীপের দাদার অমতের কথাটা জান তো ?

খুব জানি।

শেষ পর্য্যন্ত যে মত হয়েছিল, তা জান?

সবিস্ময়ে বলিলাম, কই, না! আমি তো জানি দাদারই বরাবর অমত।

বরাবর নয়, তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত। এর মধ্যে একটা হিস্ট্রি আছে।

হিস্ট্রি?

হ্যাঁ।

বলিলাম, চল, হাঁটতে হাঁটতে বাড়িমুখো এগুনো যাক, ততক্ষণ দিলীপ-রাজার ইতিহাস শোনা যাবে।

তাই শোন। তুমি চ'লে যাওয়ার দিন-কয়েক আগে থেকে দিলীপ তোমার কাছে খুব হাঁটাহাঁটি করছিল, না?

সলজ্জে কহিলাম, হ্যাঁ, সেই ইরানের চাকরির ঠিকানার জন্যে। আমি দিয়ে উঠতে পারি নি।

জানি। তারও কিছু দিন আগে মৃণালরা গিয়েছিল আগ্রা বেড়াতে। সেখানে একটি পরম সুপাত্রের খোঁজ পাওয়া গেল, যাকে খানিক আগে দেখলে।

ছেলেটি বিলেত থেকে কাগজ তৈরি না কি শিখে এসেছে, আগ্রায় কল বসাবে। বাপের অঢেল টাকা, ছেলের গাড়ি দেখেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছ।

দেখা গেল, ছেলেটি মৃণাল সম্বন্ধে একটু ইণ্টারেস্ট নিচ্ছে। মৃণালের মা-বাবা একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কারণ ছেলে দিলীপের মত অ্যাডোনিস না হ'লেও বেশ সুপুরুষ, বিলেত-ফেরত এবং ছেলের বাবা টাকার আণ্ডিল, যার কাছে দিলীপকে গরিব বলা চলে।

কথাটা পাড়বেন-পাড়বেন করছেন এবং পাড়লেই সুফল ফলবে

এমন আশাও পাওয়া গিয়েছে, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত। দিলীপের দাদার চিঠি, সকল দিক বিবেচনা ক'রে তিনি নাকি দেখলেন যে, মৃণালের সঙ্গে দিলীপের বিয়ে হ'লে অত্যন্ত সুখের কথা হবে, অতএব ওঁরা যেন তাজমহল দেখে ফিরে এসেই দিন ঠিক ক'রে ফেলেন।

মৃণালের বাবা ভয়ানক বিবেকী লোক। তিনি ঠিক করলেন, মৃণালের মতটা নেওয়া দরকার। অবশ্য সে দিলীপকেই বিয়ে করতে চাইবে, তবু যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত বদলানো যায়।

মৃণালকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল এবং তিনি সলজ্জ হেসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে জানালেন যে, আগ্রাওয়ালা ছেলেটিই—

অর্থাৎ আগ্রাওয়ালার বহু টাকা আছে, যার দশ ভাগের এক ভাগও দিলীপের নেই। মেয়েরা অঙ্কটা বোঝে ভাল, বিশেষ ক'রে ভাল্‌গার ফ্র্যাক্‌শন।

অনেকক্ষণ কথা না কহিয়া চলিয়াছিলাম। খেয়াল হইল, ভবানীপুরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বলিলাম, তুমি এবার যাও, আমি ট্রাম নিই।

সে বলিল, পাগল নাকি, চল, দিলীপের বাড়ি ঘুরে আসা যাক, কাছাকাছিই।

দিলীপ কি আজকাল কলকাতাতেই নাকি?

হ্যাঁ, চল, দেখা হ'লে খুশি হবে।

আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিলাম, রাত নটা বেজে গেছে কোন্ কালে, এখন ভদ্রলোকের বাড়ি—

দিলীপ আবার ভদ্রলোক হ'ল কবে থেকে? চল, ভোগাস নি।

বাধ্য হইয়া চলিলাম।

বুঝিলাম, সায়ানাইড অপেক্ষাও তীব্রতর বস্তুর প্রয়োজন কেন হইয়াছিল। দেশের মাটির উপর টান সহসা কেমন করিয়া লুপ্ত হইল, পারস্য-উপসাগরে যাওয়ার হাস্যকর ব্যস্ততা কোথা হইতে আসিল, সব এক নিমেষে বুঝিয়া ফেলিলাম।

আমি দূর মধ্যপ্রদেশের উত্তপ্ত মাটির ভিতরে যে অঙ্গারের সন্ধান করিতেছি, সে বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায় সেই অঙ্গার খুঁজিয়া পাইয়াছে। খুঁজিয়াছিল হীরক, মিলিল অঙ্গার। একই জিনিস, অন্তত বৈজ্ঞানিকের কাছে।

মৃণালকে দোষ দিব কি করিয়া, সে তো শত-লক্ষ সমধর্মীর একজন মাত্র। অগ্নি দাহ করে বলিয়া তাহাকে দোষ দিলে চলিবে কেন? আগুন লইয়া খেলা করিলে হাত তো পুড়িবেই।

খানিকটা হাঁটিয়া দিলীপের বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। দিলীপ দেখিয়া নিঃসন্দেহ খুশি হইল এবং এক পেয়ালা চা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল।

রাত সাড়ে নয়টা ঠিক চায়ের সময় না হইলেও রাজি হইলাম। খুশি হইলাম এই ভাবিয়া যে, দিলীপ একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে নাই। অবশ্য সাত-আট মাস সময় হয়তো তাহার মনের উপর অনেকটা কাজ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদা-বউদি কোথায়?

সে বলিল, শ্যামবাজারে গেছেন, থিয়েটার দেখতে।

তুই একা বাড়িতে?

সে যেন সবিস্ময়ে বলিল, একা? না, একা কেন হবে, আর একজন আছে। জানতিস না?

জ্ঞানেন্দুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

একটু চমকিত হইলেও খুশি হইয়া বলিলাম, বউ দেখাবি না?

বউ দেখানোর প্রয়োজন হইল না। চাকর চায়ের ট্রে হাতে ঢুকিল, পিছনে একটি সুন্দরী বধূ।

এবারে এক মুহূর্তেই চিনিলাম, মৃণালেরই ছোট বোন মানসী।

রায়-বংশের রামায়ণী

একটি ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় ইতিহাসের আরম্ভ এবং আর একটি অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় ইতিহাসের শেষ।

১২৪৪ সালের এক মধ্যাহ্নে বাংলার এক অখ্যাত জমিদার-বাড়ি হইতে ছোট ছেলে ধর্ম্মদাস রায় সস্ত্রীক বাহির হইয়া গেলেন, অথবা বিতাড়িত হইলেন। কারণ, যে ছেলে বাপের অনভিমতে চতুর্থ বার বিবাহ করিতে পারে, গৃহে তাহার স্থান না হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রথম বিবাহ অবশ্য বাপ-মাই দিয়াছিলেন। আর সে বিবাহের সময় ধর্ম্মদাসের বয়স ছিল এগারো, কাজেই তাঁহার মতামতের কথা উঠিতেই পারে না। নববধূ নয় বৎসর বয়সে শ্বশুরালয়ে পা দিল, এবং বছর-খানেকের মধ্যেই সিঁথির সিঁদুর ও লালপাড় শাড়ি লইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল। ধর্ম্মদাস নামক বালকটির কিছুকাল খেলার সাথীর অভাব বোধ হইল বটে, কিন্তু তাহার পরে সেও ভুলিয়া গেল।

তাহার পরে অনেক দিন কেহ আর ধর্ম্মদাসের বিবাহ লইয়া মাথা ঘামায় নাই। কারণ, বাপের তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, পৌত্রমুখ দেখিবার জন্য চট করিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে অভাব উপরের ছয়টি ছেলে দিয়া পূরণ হইতে পারে।

দীর্ঘ আট বৎসর বিপত্নীক জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মদাস বিবাহের জন্য উসখুস করিতে লাগিলেন। কিন্তু জমিদারের ছেলে হইলেও ধর্ম্মদাস সপ্তম এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাহার উপর মোটেই সুপুরুষ নয়। কাজেই সমান ঘরে ধর্ম্মদাসের জন্য সুরূপা মেয়ে জুটিল না। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই

দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল বনিয়াদী ঘরের পাঁচপাঁচি চেহারার একটি মেয়ের সঙ্গে। অনিচ্ছাটা বাপ-মার দিক দিয়া, ধর্ম্মদাসের দিক দিয়া নহে। ধর্ম্মদাস বধূ পাইয়াই মোটের উপর খুশি ছিলেন।

বিবাহকালে বধূর বয়স ছিল বারো। চার বছর স্বামীর ঘর করিয়া সেও পূর্ব্বতন সপত্নীর পথে যাত্রা করিল। ধর্ম্মদাস প্রথমে খানিকটা চীৎকার করিয়া কাঁদিলেন, তাহার পরে বাড়ির আর কাহারও চোখে জল না দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিলেন। অবশেষে শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়া গেলে বাড়ির এক প্রৌঢ় চাকরকে সঙ্গে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অনেককাল কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

মা কাঁদিলেন, ভাইরা এবং ভ্রাতৃবধূরা নাক সিঁটকাইল, বাপ বলিলেন, মরুক হারামজাদা। অর্থাৎ সপ্তম, কনিষ্ঠ, এবং কুরূপ পুত্রের সম্বন্ধে যতটা উৎকণ্ঠা দেখানো চলে, তাহাও কেহ দেখাইল না।

তিন মাস পরে ধর্ম্মদাস ফিরিলেন; সঙ্গে চাকর এবং আরও একটি লোক। তাঁহার তৃতীয়া স্ত্রী।

মা আবার কাঁদিলেন। ধর্ম্মদাসের অনুপস্থিতি অনেকখানি গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল, শোকের উচ্ছ্বাস থাকিলেও ভিতরের প্রাবল্য ছিল না। কিন্তু সে যদি ফিরিয়াই আসিল, তবে আবার এ কি করিয়া আসিল? রায়-বংশের মুখে কি এমনই করিয়াই মসীলেপন করিতে হয়? কে জানে কোন্ অজ্ঞাতকুলশীল হা-ঘরের মেয়ে? ভরার মেয়ে কি না, তাহাই বা কে জানে?

বাপ বলিলেন, হারামজাদাকে মেরে দূর ক'রে দাও। ছয় ভাই অবিলম্বে আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু সঙ্গের অবগুণ্ঠিতা

মেয়েটিকে লইয়া বিপদে পড়িল। তাহাদের নিজের নিজের স্ত্রী ঠ্যাঙানো অভ্যাস থাকিলেও ভাদ্রবধূ—এবং নববধূ—তাহাকে ঠ্যাঙানো চলে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। আর নববধূর সামনেই বা তাহার স্বামীর উপর দিয়া ভূমিকম্প চালানো যায় কি করিয়া? অতএব ধর্ম্মদাস বাঁচিয়া গেলেন এবং সস্ত্রীক বাড়িতে স্থান পাইলেন; অনেকটা মায়ের চোখের জলের জোরে।

বধূ সুন্দরী। বড় ছয় বউ কুৎসিত নহে, কিন্তু শশিমুখীর পায়ের ধারেও তাহারা দাঁড়াইতে পারে না। তবু নববধূর আগমনে প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঈর্ষার উৎপত্তি হইল না, শুধু তাহার স্বভাবের গুণে। এমন কি প্রথমাবধি বিরূপ শ্বশুরের মনও অবিলম্বে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু বধূর সন্তানাদি হইল না। চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ হইয়া উনিশ বছর পর্য্যন্ত নিঃসন্তান থাকিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক। কিন্তু শশিমুখী নিজের গুণে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিল, তাই এতবড় খুঁতটাও কেহ দেখিয়াও দেখিল না। সে ফলবিহীন লতার মত পুষ্পসম্ভার লইয়া লোকচিত্ত মুগ্ধ করিয়া চলিল, ফলের অভাব কাহারও মনে আসিল না।

কিন্তু সহসা একদিন শশিমুখী পুকুরঘাটে স্নান করিতে গিয়া ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না।

প্রথমা ও দ্বিতীয়ার মৃত্যুতে যাহা হয় নাই, এইবার তাহা হইল। রায়-বাড়িতে শোকের বন্যা বহিয়া গেল। বধূর জলস্ফীত বীভৎস দেহের চারিদিক ঘিরিয়া ছয় জায়ে কাঁদিল। মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। শ্বশুর শিশুর মত উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। ছয় ভাশুর সজল নয়নে বধূর মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিল। শুধু যাঁহার সবচেয়ে বেশি কাঁদা উচিত ছিল, তিনি চুপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে

চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহার চোখে এক বিন্দু জল দেখিতে পাইল না।

দুই দিন পরে ধর্ম্মদাস পুরাতন চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠিক আগের বারের মত। এবারও মা কাঁদিলেন, কিন্তু ছেলের জন্য নহে, মৃতা বধূর শোকে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িতে একটা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার ছায়া পড়িল, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় যেমন হয়। আশঙ্কা যে অকারণ নহে, তাহা দুই মাস পরে জানা গেল, যখন ধর্ম্মদাস চতুর্থী এবং শেষ বধূকে লইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

তাঁহার নদীঘাট পর্য্যন্ত আগমনবার্ত্তা বাড়িতে আগেই পৌঁছিয়াছিল। জমিদার-বাড়ির বহির্বাটী উৎসুক জনতায় ভরিয়া গেল, তামাসাটা কেমন দাঁড়ায় দেখিবার জন্য। দ্বারদেশে পিতা স্বয়ং কাষ্ঠপাদুকা হস্তে উপস্থিত থাকিলেন। অভ্যর্থনা একটু গুরুতর রকমেরই হইল, কারণ শশিমুখীর শোক শ্বশুর তখনও ভুলেন নাই।

মা কাঁদিলেন কি না টের পাওয়া গেল না। শ্বশুর প্রাচীরের বাহিরে দণ্ডায়মানা সঙ্কুচিতা লাল চেলি পরা মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার তো কোন দোষ নেই মা, তুমি এস। কিন্তু ও হারামজাদাকে আমি চৌকাঠ পার হতে দোব না।

অবগুণ্ঠনের মধ্যেই মাথা নাড়িয়া বধূ অসম্মতি জানাইল। বধূ বয়স্থা, বছর ষোল বয়স হইয়াছে, এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার বিদ্যালয়ে খানিকটা বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে।

নৌকা তখনও ঘাটে বাঁধা ছিল। ভবিষ্যদ্দর্শী ধর্ম্মদাস এ বন্দোবস্তটুকু আগেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে উজানের মুখে ধর্ম্মদাস এবং তাঁহার চতুর্থী পত্নী নীরদাকে লইয়া নৌকা ভাসিয়া চলিল, কেহ একবারও পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন না।

নদীর বাঁকে নৌকা ঘুরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মদাসের গ্রাম, তাঁহার তিরিশ বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত ছায়াশীতল পিতৃপিতামহের ভিটা চিরকালের মত পিছনে পড়িয়া রহিল।

নদীপথে কয়েকটি বৈচিত্র্যবিহীন দিনরাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরে নববধূর হাত ধরিয়া গুটিকয়েক মাত্র টাকা সম্বল করিয়া ধর্ম্মদাস কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

তখন কোম্পানির যুগ। জীবনের অনেকগুলি বৎসর বিবাহে ব্যয় করিলেও ফাঁকে ফাঁকে ধর্ম্মদাস খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এইবার তাহা কাজে লাগিল। ধর্ম্মদাস নয় টাকা বেতনে একটি কাজ যোগাড় করিয়া ফেলিলেন।

স্ত্রীভাগ্যে ধন কথাটি যদি সত্য হয়, তবে ধর্ম্মদাসের চতুর্থা স্ত্রীর ভাগ্য ভালই ছিল। কারণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধর্ম্মদাসের অবস্থা দিব্য ফিরিয়া গেল।

তাহার পরে আসিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ। ধর্ম্মদাস অটল হইয়া কোম্পানির সেবা করিলেন, অর্থাৎ তিন গুণ মূল্যে গোরা সৈন্যের রসদ যোগাইলেন। অবশেষে গোলমাল মিটিয়া গেলে, এবং মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিলে লাভ-লোকসান হিসাব করিয়া দেখা গেল, লোকসান—শূন্য, লাভ—প্রায় লক্ষ টাকা।

বিজয়সিংহ পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসও এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রাম কলমীতলা ত্যাগ করিয়া চিৎপুর অঞ্চলে নূতন করিয়া রায়-বংশের পত্তন করিলেন।

ধর্ম্মদাসের প্রথম তিন স্ত্রী যাহা দিতে পারে নাই, নীরদা তাহাই দিয়াছিল—সন্তান।

ছেলে অবশ্য খুব সুশ্রী হয় নাই। কারণ বাপ ও মা উভয়ের এক জনেরও রূপ ছিল না। কিন্তু ছেলের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, গুণে রূপের অভাব পোষাইয়া গিয়াছে, ব্যবসাবুদ্ধিতে ছেলে বাপের উপর দিয়া যায়।

ইতিমধ্যে ধর্ম্মদাস কালিদাসের বিবাহ দিয়াছিলেন; রূপ দেখিয়া নহে, মেয়ের বাপের টাকা দেখিয়া। বাপের একমাত্র মেয়ে এবং ছেলে নাই। অতএব শ্বশুরের টাকার অঙ্কটাও কালিদাসের হিসাবের খাতায় জমার ঘরে আশ্রয় লইল।

ক্রমাগত অর্থার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মদাস যখন একটু বিশ্রাম লইবার চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স সত্তর হইয়াছে। ছেলে কালিদাসের বয়স হইয়াছে প্রায় চল্লিশ। বিশ্রামের প্রয়োজন হয়তো তখনও হইত না, যদি না সহসা কয়েক দিনের জ্বরে নীরদার মৃত্যু হইত। ছেলের উপর ব্যবসা-পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার দিয়া ধর্ম্মদাস ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিলেন।

কিন্তু অপরিমিত পরিশ্রমের মধ্যে যাঁহারা জীবন কাটাইয়াছে, জীবন-সায়াহ্নে তাহাদের পূর্ণ বিশ্রাম সহ্য হয় না। কর্ম্মবিরতির অলস জীবন ধর্ম্মদাসের সহিল না, বছর-দেড়েকের মধ্যেই গুরুতর অসুখে পড়িলেন।

কবিরাজ বলিলেন, মিছে ভয় পাচ্ছেন রায় মশায়, আপনার শরীর এখনও খাসা তাজা রয়েছে, মাস-খানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন। এই পাঁচনটা, আর এই—

ধর্ম্মদাস বাধা দিয়া বলিলেন, ও পাঁচনে আর কাজ নেই, তার চেয়ে বরং কালিদাসকে পাঠিয়ে দিন। জীবনে ধর্ম্মদাসের একদিনের জন্যও অসুখ করে নাই, কাজেই বাহাত্তর বৎসরে এই অসুস্থতা যে প্রথম এবং শেষ অসুস্থতা, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

কালিদাস আসিল, পৌত্র শিবদাস আসিল। শিবদাসের বয়স কুড়ি, বছর-দুই আগে লেখাপড়ার পাট তুলিয়া দিয়া অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মদাস বলিলেন, শিবু, এ কারবার আমি কেমন ক'রে গ'ড়ে তুলেছি জান তো?

শিবদাস জানে।

তোমার বাবা তৈরি কারবারে ঢুকেছিল। তুমি তার চেয়েও ঢের বেশি তৈরি কারবারে ঢুকেছ। একে বাঁচিয়ে রেখো। রায়-বংশের মান যেন ঠিক থাকে।

রায়-বংশের মান ঠিকই থাকিবে। প্রথম যৌবনে দুস্তর সমুদ্রে ফুটা নৌকা ভাসাইয়া ধর্ম্মদাস পাড়ি জমাইয়াছিলেন। সগৌরবে তীরে আসিয়াছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে একটি মাত্র জিনিসের চিন্তা তাঁহার মন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা অর্থ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন অর্থাগম হইল, প্রয়োজন যখন আর রহিল না, তখনও অর্থের নেশা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে না, টাকার থলি, নোটের তাড়া ও কোম্পানির কাগজের চারিদিকে ঘোরে, এ সত্য ধর্ম্মদাস প্রথম যৌবনেই জানিয়াছিলেন।

সেই প্রবল অর্থচিন্তার মধ্যে কালিদাসের জন্ম। তাহারই পুত্র শিবদাস। অতএব অর্থের দিক দিয়া রায়-বংশের সম্মানরক্ষা সম্বন্ধে কোন চিন্তার কারণ ছিল না।

শেষ দিনে পুত্র, পৌত্র, দুই কন্যা এবং গুটিকয়েক দৌহিত্র-দৌহিত্রী-পরিবৃত অবস্থায় মুমূর্ষু ধর্ম্মদাস বলিলেন, তোমরা কেঁদো না, আমি তার কাছে যাচ্ছি।

তার কাছে অর্থে নীরদার কাছে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা,

বিরাজমোহিনী, এবং শশিমুখীর সম্বন্ধে ধর্ম্মদাসের মতামত জানা গেল না।

কবিরাজ সূচিকাভরণ লইয়া শেষ চেষ্টা করিতে গেলেন। ধর্ম্মদাস বলিলেন, চুলোয় যাও। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। মনে হইল, কি যেন বলার চেষ্টা করিতেছেন। কিছু শোনা গেল না, শুধু নিমীলিত দুই চোখ দিয়া দুইটি জলরেখা বহিয়া গেল। রোরুদ্যমানা বড় মেয়ে বাপের মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, কিছু বলছেন? তিনি চুপিচুপি বলিলেন, কলমীতলার জন্যে মন কেমন করছে।

কিন্তু আর সময় নাই। কলমীতলায় ফিরিবার লগ্ন বহু বহু বৎসর আগে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান, তাঁহার শৈশব-কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র, ছায়াচ্ছন্ন বনানীবেষ্টিত কলমীতলার জন্য আজ আর মন কেমন করিলেই বা কি? সাতচল্লিশ বৎসর আগে যে গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা বহু দূরে পড়িয়া আছে, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আর নাই।

সে পুরাতন রায়-বংশেরই বা কি হইয়াছে, কে জানে? আর একটি লক্ষ্মীর মত রূপসী কিশোরী, তাঁহার বার্দ্ধক্যের জীবনের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে যাহার স্মৃতি উঁকি মারিয়াছে, কি ছিল তাহার নাম? ধর্ম্মদাস মনে করিতে পারিলেন না।

মধ্যরাত্রিতে বিকারের ঘোরে ধর্ম্মদাস সহসা অস্পষ্ট স্বরে কাহাকে যেন ডাকিলেন, শশিমুখী! ছেলেমেয়ে নাম শুনিয়া কিছু বুঝিল না, অবাক হইয়া রহিল।

একটু পরে ধর্ম্মদাস মারা গেলেন।

এমনই করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। কত শীত-গ্রীষ্ম-বসন্তের আবর্ত্তন, কত দুর্ভিক্ষ, কত রাষ্ট্রবিপ্লব। ধর্ম্মদাস গেলেন, কালিদাস গেলেন, শিবদাসও গেলেন। পুরুষানুক্রমে একটি জিনিসের ধ্যানে তিন পুরুষের জীবন কাটিল, বাহিরের পৃথিবী, যেখানে আকাশে চাঁদ উঠে, বসন্তে বন পুষ্পসম্ভারে ভরিয়া যায়, যে পৃথিবীতে মানুষ ভালবাসে, দুঃখকষ্টবেদনায় জর্জ্জরিত হয়, এবং সেই দুঃখের মধ্য দিয়া সুখ খুঁজিয়া বাহির করে, এই জন্মমৃত্যু-আনন্দবেদনার আবর্ত্তনময় পৃথিবী, তাহার সংবাদ কেহ রাখিলেন না। অগণিত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গেল, অন্ধকার রাত্রির আকাশে কত তারকা কত দীপ জ্বালিল, এসব তাঁহাদের চোখে পড়িল না।

শিবদাস পিতা ও পিতামহের মত দীর্ঘজীবী হন নাই। কাজেই পুত্র দেবীচরণ যখন কারবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ত্রিশ। দেবীচরণ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। লেখাপড়া অর্থে ব্যবসায়ের কাজে যতটুকু লাগে ততটুকু নহে, সে রকম লেখাপড়ায় তাঁহার আগের তিন পুরুষও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দেবীচরণ যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, সে যুগে ইংরেজী না শিখিলে চলে না। দেবীচরণ স্কুল ও কলেজে পড়িয়া কালোপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া তবে ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিলেন।

বিপদ বাধিয়াছিল ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী লইয়া। দেবীচরণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন, তখন দেবীচরণের বয়স পঁয়তাল্লিশ। সাধারণ অবস্থায় সে বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ না করিলেও চলে, কিন্তু দেবীচরণের সাধারণ অবস্থা নহে, তাঁহার ব্যবসায়, তাঁহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার রাশি, সেসবের তো একটা সদ্গতি হওয়া দরকার? দেবীচরণ আবার বিবাহ করিলেন, গরিবের

ঘরের সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া, এবং দুই বৎসর পরে পঞ্চম পুরুষ অসিতরঞ্জনের জন্মের পর দেখা গেল, রায়-বংশে নূতন জিনিস আসিয়াছে —রূপ। কিন্তু ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়া মায়ের জীবন শেষ হইয়া গেল, কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সম্মিলিত চেষ্টাতেও তাঁহাকে বাঁচানো গেল না। দেবীচরণ ছেলেকে বুকে লইয়া স্ত্রীর শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, হয়তো ভুলিলেনও।

সান্ত্বনার কারণ ছিল। রায়-বংশের অতুল বৈভব ভোগ করিবার মত উত্তরাধিকারী আসিয়াছে, যে উত্তরাধিকারীর জন্য দেবীচরণকে একান্ত অনিচ্ছায় প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

অসিতের পঁচিশ বৎসর বয়সে দেবীচরণ পুত্রবধূ আনিলেন। রূপবান ছেলের জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন অসামান্য রূপ। সে রূপ ধনীর ঘরে পাওয়া গেল না; পাওয়া গেল দরিদ্র কেরানীর ঘরে। কিন্তু অসিতের জন্য বহু টাকার মালিক শাঁসালো শ্বশুরের প্রয়োজন নাই, টাকা তাহার ঘরেই আছে।

সুমিত্রার রূপ যেন আগুনের শিখা। কিন্তু তাহাতে দাহ নাই, আছে স্নিগ্ধ প্রভা, যাহা শুধু বাংলা দেশেই মেলে।

দেবীচরণ বৃদ্ধ বয়সে আফিং ধরিয়াছিলেন। কারবারের কাজ ছেলের হাতে দিবার ফলে যে অবসরটুকুর সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবত তাহা ভরাট করিবার উদ্দেশ্যে। আফিঙের নেশায় মানুষের দেহটাকে যেমন ঝিমাইয়া দেয়, সম্ভবত মনটাকে তেমনই সক্রিয় করিয়া তোলে। দেবীচরণ যৌবনকালের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, সে স্বপ্নের বিষয়বস্তু ছিল তাঁহার প্রথমা পত্নী মহামায়া এবং টাকা।

কিন্তু সহসা বিধবা বোন আসিয়া চুপিচুপি এমন একটি সংবাদ দিয়া গেলেন যে, এক মুহূর্ত্তে তাঁহার মনের বয়স কুড়ি বছর কমিয়া গেল, সিকি ভরি পরিমাণ আফিংও যাহা করিতে পারে নাই। রায়-বংশে নূতনতম উত্তরাধিকারী আসিতেছে, নবপর্য্যায়ের ষষ্ঠ পুরুষ।

সে যে উত্তরাধিকারী না হইয়া উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, সে সম্ভাবনা তাঁহার মনে আসিল না। নাতির নাম কি দিবেন, ভাবিতে ভাবিতে ডাকিলেন, বউমা!

স্থমিত্রা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আহ্বানের কারণটা অনুমান করিয়া মুখে আসিয়াছিল রক্তাভা। বলিল, ডাকছেন বাবা?

গড়গড়ার নলটা নামাইয়া চোখ মেলিয়া দেবীচরণ বলিলেন, হ্যাঁ, ডেকেছিলাম, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। আর দেখো, বেশি যেন ছুটোছুটি ক'র না।

বধূ পলাইয়া বাঁচিল।

তাঁহার পৌত্রের নামের জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। দেবীচরণ তাক হইতে অভিধানখানা খুলিয়া বসিলেন।

রায়-বংশের আগামী ষষ্ঠ পুরুষ। তাহার নাম চট করিয়া দেওয়া চলে না, আগমনসম্ভাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়।

গোলমাল বাধাইল অসিত। মাস-চারেক পরে একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া বলিল, বাবা, আমার একটু যে না বেরোলে চলে না!

দেবীচরণের ঝিমানি আসিয়াছিল। তন্দ্রা ভাঙিয়া বলিলেন, অ্যাঁ! বেরোতে হবে? কোথায়?

বিলেতে। বেশি না, মাস ছয়েকের জন্যে।

দেবীচরণের সিকি ভরি আফিঙের নেশা এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল। ঈজি-চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া অব্যক্ত স্বরে বলিলেন, তার মানে?

বিলাতের যে কয়টি কোম্পানির সহিত ইহাদের ব্যবসাসূত্রে সম্বন্ধ, স্বয়ং গিয়া একবার তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া উপযুক্ত চাল চালিতে পারিলে লাভের যে আশা আছে, তাহার সহিত তুলনায় সাময়িকভাবে ভারত হইতে অনুপস্থিতি কিছুই নহে। দেবীচরণ ধর্ম্মদাস রায়ের প্রপৌত্র, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সময় লাগিল না।

বলিলেন, কিন্তু বউমা?

বিদেশগমনের বিপক্ষে ইহার চেয়ে বড় যুক্তি আর হইতে পারে না। অসিতরঞ্জন দিন-পনরো ধরিয়া সংশয়-দোলায় দুলিল, তাহার পর রায়-বংশের উপযুক্ত প্রতিনিধির মত যাওয়াই স্থির করিল। বেশি দিনও আর নয়। মাস ছয়েক; কমও হইতে পারে।

বধূ আপত্তি করিল না। অবশ্য মৌখিক আপত্তি না করিলেও তাহার মৌন আপত্তির পরিমাণ উপলব্ধি করিতে অসিতের কষ্ট হয় নাই, তাই হাওড়া স্টেশনে বিদায়কালে যখন সে সুমিত্রাকে বলিল, ভেবো না সুমি, কোন রকমে চোখ কান বুজে এই কটা দিন কাটিয়ে দাও, কেমন? তখন বধূ অশ্রুগোপনের কোন চেষ্টা করিল না। এক প্ল্যাটফর্ম জনতার সামনেই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। দেবীচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, দুর্গা দুর্গা!

পরদিন বধূর চোখমুখের চেহারা লক্ষ্য করিয়া দেবীচরণ শঙ্কিত হইলেন। বলিলেন, বউমা, অসুখ করে নি তো?

বধূ মাথা নাড়িল।

শ্বশুর চিন্তিতভাবে বলিলেন, তাই তো! একটু ভাবিয়া বলিলেন,

দিন-কতক তোমার বাবার কাছে বেড়িয়ে এস। বধূ ইহাতেও সম্মতি দিল না। রায়-বংশের বধূ কথায় কথায় কেরানী পিতার বাড়ি গেলে বংশ-মর্য্যাদা যে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়, পিসীমার মারফৎ সে খবর সে আগে পাইয়াছিল। বাহির হইতে মনে হইতে পারে, পিসীমা দেবপূজা ও জপের মালা ছাড়া আর কিছু জানেন না, কিন্তু সে ধারণা ভুল হইবে। সুমিত্রা যে গরিবের মেয়ে হইয়াও এ বাড়ির বধূরূপে আসিতে পারিয়াছে, তাহা যে নিতান্তই পূর্ব্বজন্মের অশেষ পুণ্যফলে, তাহারও আভাস-ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ইঙ্গিতের উপরে বেশি দূর উঠিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ভাই এবং ভাইপোকে ভয় করিতেন। কিন্তু ঐটুকুই সুমিত্রাকে বুঝানোর পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল, সুমিত্রা বুদ্ধিমতী মেয়ে।

মাসখানেক আগে বধূ একবার বাপের বাড়ি ঘুরিয়া আসিয়াছে কয়েক দিনের জন্য। আবার ইহারই মধ্যে আর একবার যাওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। অগত্যা ঠিক হইল কলিকাতার বাহিরে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া। শ্বশুর এইবার নিজের অসুস্থ শরীরের দোহাই পাড়িলেন, ফলে বধূ আপত্তি করিতে পারিল না।

কিন্তু কালিম্পং দূরে থাক, বাড়ির বাহির হওয়াই ঘটিয়া উঠিল না।

জিনিসপত্র গাড়িতে উঠানো হইয়াছে। দেবীচরণ বধূর সাহায্যে নামিতে গেলেন। নামিবার জন্য যে সত্যই সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। সত্তর বৎসর বয়স হইলেও দেবীচরণ ততটা অশক্ত হন নাই। কিন্তু বার্দ্ধক্যের খানিকটা বিলাসিতা তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; যতটা পরিশ্রম না করিলে নয়, তাহার বেশি খাটিতে তিনি রাজি ছিলেন না।

সিঁড়ির কার্পেটে সম্ভবত কোন দোষ ছিল, দেবীচরণের পা হড়কাইয়া গেল। পড়িয়াই যাইতেন, শুধু বধূ ধরিয়া থাকার ফলে

সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া সুমিত্রা বাকি পনরো-ষোলটা ধাপ গড়াইয়া নীচে পড়িল।

দুর্ঘটনার ইতিহাস ইহাই।

চাকর-বাকর ছুটিয়া আসিল, পিসীমা আসিলেন। সুমিত্রার অচেতন দেহ লইয়া ড্রইং-রুমে সোফার উপর শোয়ানো হইল। শোফার গাড়ি লইয়া ডাক্তারের বাড়ি ছুটিল।

ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন দেবীচরণ প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন। শুধু তাঁহার পতন নিবারণ করিতে গিয়াই যে দুর্ঘটনা ঘটিল, ইহাতে তিনি অধীর হইয়াছিলেন আরও বেশি। কিন্তু দুর্ঘটনার গুরুত্ব তখন পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ডাক্তার রোগিণীকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, এই মুহূর্ত্তে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

দেবীচরণ খানিকটা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, হাসপাতাল? হাসপাতাল কি হবে?

কিন্তু আপত্তি টিকিল না। অচেতন সুমিত্রাকে লইয়া গাড়ি হাসপাতালের দিকে ছুটিল। দেবীচরণ ড্রইং-রুমের এক প্রান্তে নির্জীব-ভাবে বসিয়া রহিলেন, একটি কথাও কহিলেন না, সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাবও করিলেন না।

রাত বারোটার সময় ডাক্তার আবার আসিলেন। দেবীচরণ তখনও তেমনই ভাবেই বসিয়া আছেন। ডাক্তার একটু ইতস্তত করিয়া ডাকিলেন, মিঃ রায়!

দ্বিতীয় বার ডাকার পর দেবীচরণ মুখ তুলিলেন। এতক্ষণে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। যে কোন দুঃসংবাদের জন্য তিনি প্রস্তুত। বলিলেন, বউমা এখনও বেঁচে আছেন?

ডাক্তার বলিলেন, না না, সে কি, সে ভয় করবেন না। বউমা ভালই আছেন, মানে যতটা ভাল থাকা সম্ভব। আপনি বরং কাল একবার গিয়ে দেখে আসবেন। কিন্তু—

ডাক্তারকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া দেবীচরণ বলিলেন, কি ? আমি সব শুনতে পারব। বউমার পেটের সন্তান—

আর নেই। বাকি কথাটা ডাক্তার পূরণ করিয়া দিলেন।

দেবীচরণ রাত্রির অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

যে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্য এত উৎসাহ, এত আনন্দ, যাহার জন্য ছয় মাস ধরিয়া চিন্তা করিয়াও উপযুক্ত নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার নামেরই কোন প্রয়োজন হইল না। কাহার অপরাধে ?

দেবীচরণ স্থির করিলেন, অপরাধ তাঁহারই, আর কাহারও নহে।

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনা এমন কিছু বড় নহে, এ রকম তো হামেশাই হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর যেসব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই মাতৃগর্ভেই বিদায় লয়, তাহারা তো কেহ রায়-বংশের উত্তরাধিকারী নহে।

রায়-বংশের উত্তরাধিকারী ! দেবীচরণ বার-কয়েক মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করিলেন, তাহার পরে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাহার জন্য ? অজাত শিশুর শোকে ? রায়-বংশের উত্তরাধিকারীর শোকে ? না, তাঁহারই দোষে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিল, তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া, সেই লজ্জায় ? দেবীচরণ নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

হাসপাতাল হইতে ফিরিতে সুমিত্রার দিন-পনরো লাগিল। যেদিন প্রথম বাড়ি ফিরিল, সেদিন কিন্তু বধূকে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বধূর স্বাস্থ্যহীন মুখ, পাণ্ডুর বর্ণ দেখিয়া

তাঁহার চোখে জল আসিল। দেবীচরণ বধূকে বুকে লইয়া কাঁদিলেন। তাহারই জন্য, উত্তরাধিকারীর শোকে নহে।

দুর্ঘটনার বিবরণ অসিতকে লেখা হইয়াছিল। আহত সে হইয়াছিল, কিন্তু এতখানি শোকাচ্ছন্ন হওয়ার কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। লিখিয়াছিল, "আমাদের প্রথম সন্তানের শোকে এতখানি অভিভূত হয়ে পড়লে চলবে না। তোমার শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করব না। শুধু একটা কথা বলব—courage! জীবনপথে অনেক বিপদ আসে, এ শুধু তাদেরই একটা, এ বিপদ আমাদের তুচ্ছ ক'রে চলতে হবে।"

কিন্তু সুমিত্রা সান্ত্বনা পাইল বলিয়া মনে হইল না।

চার মাস পরে অসিত ফিরিল। দেবীচরণের শরীর ভাল ছিল না, তিনি স্টেশনে গেলেন না। বধূর পক্ষে তখনও যাওয়া সম্ভব নয়। অসিত স্টেশন হইতে একাই বাড়ি আসিল।

পিসীমা তারস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, সম্ভবত অসিতের আগমনে তাহার ছেলের শোক তাঁহার বেশি করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। অসিত সেদিকে তাকাইলও না; এমন কি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রণামটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল।

সুমিত্রা কাঁদিতেছে। অসিত দুই হাতে তাহাকে উঠাইয়া বলিল, ছিঃ সুমি, আজও কাঁদছ? এতটুকু কষ্ট যদি সহ্য করতে না পার, তা হ'লে এর চেয়ে বড় দুঃখ যদি কোন দিন পাও, তখন কি করবে?

কিন্তু সুমিত্রা তাহার চেয়েও বড় দুঃখ পাইয়াছে। অজস্র অশ্রুর মধ্যে সে দুর্ঘটনার ইতিহাস খুলিয়া বলিল। অসিত বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রায়-বংশের উত্তরাধিকারী আর আসিবে না। একটি ক্ষুদ্র দুর্ঘটনার ফলে সুমিত্রার মা হওয়ার অধিকার চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

এক শত বৎসর আগে ধর্ম্মদাস রায় নূতন করিয়া যে রায়-বংশের পত্তন করিয়াছিলেন, পঞ্চম পুরুষে আসিয়া সেই রায়-বংশ নিঃশেষ হইয়া গেল।

পিসীমা ডাক ছাড়িয়াই কাঁদিতেন, শুধু অসিতের চোখের দিকে তাকাইয়া ক্রন্দনের মাত্রা সংযত রাখিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, দাদাকে কে বলবে ?

দেবীচরণকে কেহ বলিবে না। যে আঘাত অসিত ও সুমিত্রা পাইয়াছে, বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য দেবীচরণকে তাহার অংশীদার করিয়া লাভ কি ?

পিসীমা কান্না থামাইয়া বলিলেন, আমি বলব 'খন। অসিত খানিকক্ষণ তাঁহার দিকে চুপ করিয়া তাকাইয়া সহজ কণ্ঠে বলিল, তা হ'লে তোমাকে আমি খুন করব।

কিন্তু অবশেষে পিসীমাই বলিলেন। দেবীচরণ শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। সুমিত্রার স্বাস্থ্য খানিকটা ফিরিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হয়, না ফিরিলেই ছিল ভাল।

রায়-বংশের দেশজোড়া নাম, বিপুল অর্থ, নাই শুধু উত্তরাধিকারী। এ সমস্যার সমাধান করিবে কে ?

সমাধান ছিল। সে সমাধান সর্ব্বপ্রথম পিসীমার মাথাতেই আসিল, এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তিনি দেবীচরণের কাছে কথাটা উত্থাপন করাই স্থির করিলেন। কারণ তাঁহার কাছে দুইটি ক্ষুদ্র নরনারীর সুখদুঃখের চেয়ে বড় কথা ছিল, তাহা রায়-বংশের স্থায়িত্ব। তিনি থাকিতে, এবং উপযুক্ত উপায় থাকিতে, রায়-বংশ এমন করিয়া লোপ পাইবে, এ চিন্তা অসহ্য।

দেবীচরণের ঘরে গিয়া অর্দ্ধসুপ্ত দেবীচরণকে তিনি ডাক দিলেন, দাদা!

দেবীচরণ অসুস্থ ছিলেন বলিয়াই পিসীমা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

যে সুমিত্রা বৃদ্ধ শ্বশুরকে এমনই করিয়া বাঁচাইয়াছে, শুধু বংশরক্ষার জন্য তাহার অবমাননা করিয়া অসিতের বিবাহ দেওয়ার কল্পনা পিসীমার পক্ষে সহজ হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে নহে। তিনি মানুষ, কসাই নহেন।

পিসীমা আপন মনে গজগজ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। খুব বেশি আহত হইলেন না, কারণ এ রকম যে হইবে, তাহা তিনি আগে হইতেই আন্দাজ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মাসখানেক পরে একদিন চাকর সন্ধ্যাবেলায় দেবীচরণের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি ঈজিচেয়ারে শুইয়া আছেন, দৃষ্টি নিষ্প্রভ।

যে দেবীচরণকে বাঁচাইতে গিয়া দুর্ঘটনা, এবং যে দুর্ঘটনার এই পরিণতি, বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনিও বিদায় লইলেন। অসিত খবর পাইয়া বাড়ি ফিরিয়া সংক্ষেপে কহিল, যাক, বেঁচে গেছেন।

সুমিত্রার দিন আর কাটিতে চায় না। যে ভবিষ্যতের আশায় মানুষ শত দুঃখের মধ্যেও সাহসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া থাকে, সেই ভবিষ্যৎই যখন এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যায়, তখন সান্ত্বনার আর কিছু বাকি থাকে কই? এক একটি দিনকে এক এক যুগ বলিয়া মনে হয়।

তবু দিন কাটে। যেমন করিয়া পথের ভিখারীর কাটে, কোটিপতির কাটে, তেমনই করিয়া। হেমন্তের দিন ক্রমশ ছোট হইয়া আসে, শীতের কুয়াশায় গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। আবার ধীরে ধীরে নিষ্পত্র শ্রীহীন গাছগুলি নবকিশলয়ে ভরিয়া উঠে, আমগাছে মুকুল ধরে—

কিন্তু তাহার জীবনে শীতের আগমনে সতেজ সবুজ পাতা শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া ঝরিয়াই গেল, বসন্তের আবির্ভাবে নূতন পাতা আসিল কই? এমনই করিয়া নিষ্পত্র নিষ্ফল জীবন তাহার কত দিন চলিবে? যে অন্ধকার রাত্রির অবসান নাই, সে রাত্রি হইতে নিষ্কৃতি কবে?

সে তেমনই সুন্দরী রহিয়াছে, কিন্তু এ নিষ্ফল রূপ লইয়া চিরবন্ধ্যা নারীর জীবন লইয়া সে কি করিবে? তাহার বৃহত্তম কর্ত্তব্যই তো সে পালন করিতে পারিল না। রায়-বংশের উত্তরাধিকারী কোথায়?

চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়।

পিসীমা পরম সাহসে আবার কথা পাড়িলেন। অসিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, রাঁচি যাবে?

পিসীমা ললাটে করাঘাত করিয়া সরোদনে বলিলেন, এই না হ'লে আমার কপাল! না হ'লে নিজের ভাইপো, নিজের মায়ের পেটের ভায়ের ছেলে, সে এমনই কথা বলে? যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর?

অসিত যথাসম্ভব সংযত স্বরে বলিল, কে তোমাকে চুরি করতে বলেছে, আমি?

তুই বলবি কেন? কিন্তু আমি তো এই রায়-বংশের মেয়ে, বংশটা যাতে থাকে, সেটা দেখা তো আমার কাজ? দাদাকে বললাম, মারতে এলেন। দাদা গেলেন, তোকে বললাম, তুই—। ক্ষোভে, অপমানে পিসীমা ফোঁপাইয়া উঠিলেন।

অসিত চলিয়া গেল।

অথচ এ সম্ভাবনাটা যে তাহার মনেও উদয় না হইয়াছিল, তাহা নহে। বংশরক্ষার কথা ভাবিয়া তত নহে, যতটা তাহার বিপুল অর্থের ভবিষ্যৎ মালিকের কথা ভাবিয়া। তাহার এবং সুমিত্রার অবর্ত্তমানে এত টাকার কি গতি হইবে?

সন্তানের জন্য সন্তান, এবং টাকার জন্য সন্তান, কোন্‌টা মুখ্য, তাহাই ভাল করিয়া বুঝা গেল না।

অসিত আপন মনেই বলিল, কিন্তু আমি তো কসাই নই, আমি মানুষ।

যেন কসাইরা মানুষ নহে!

হয় পিসীমার ধৈর্য্য অসাধারণ, অথবা তিনি অসিতের কথার ভাবে কোন রকমে দ্বিধার আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, বার-কয়েক অধ্যবসায় সহকারে বুঝাইলেই অসিত শুধু ক্লান্ত হইয়াই বিবাহে মত দিবে। অতএব তিনি আবার একদিন সন্ধ্যায় নিভৃতে অসিতকে ধরিলেন।

অসিত বলিল, চুপ কর। পিসীমার কানে গলার স্বরের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা ধরা পড়িল। তিনি আশান্বিত হইয়া বলিলেন, বাবা আমার, লক্ষ্মী আমার, তুই আর একটা বিয়ে কর। বউমাকে তো ত্যাগ করতে বলছি না, বউমা আমার সোনার পিত্তিমে। দক্ষ রাজনীতিকের মত তিনি চোখে আঁচল দিলেন। সময় বুঝিয়া অশ্রুমোচন করিলে যে সময় সময় আশাতীত ফল লাভ করা যায়, তাহা তিনি জানিতেন।

অসিত অসহিষ্ণুভাবে বলিল, ও ঘ্যানর ঘ্যানর আমার ভাল লাগে না। যা পারব না—

পিসীমা বাধা দিয়া বলিলেন, কেন পারবি না বাবা আমার? তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদা পর-পর চারটে বিয়ে করেছিলেন।

অসিত বলিল, বড় কাজই করেছিলেন!

অথচ তিনি চতুর্থ বার বিবাহ না করিলে রায়-বংশেরই উৎপত্তি

হইত না। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও উত্তরাধিকারীর যুগ্ম সমস্যাও উঠিত না। এক হিসাবে ভালই হইত। অন্তত অসিতের তাহাই মনে হইল।

পিসীমা ইনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, তোকে তো আমি আর চারটে বিয়ে করতে বলছি না। আর একটা বিয়ে কর, ঘরে সোনার চাঁদ ছেলে আসুক, আমি রায়-বাড়ির বংশধর দেখে চোখ বুজি। ধর্ম্মদাস রায়ের নাতির নাতি তুই, তিনি করেছিলেন চার-চারটে বিয়ে।

একই কথার পুনরাবৃত্তি অসিতের ভাল লাগিতেছিল না। বলিল, কিন্তু তিনিও এক স্ত্রী বেঁচে থাকতে আর একটা বিয়ে করেন নি।

পিসীমা একটা কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা কাহার পদশব্দে চুপ করিয়া গেলেন। অসিত পিছন ফিরিয়া দেখিল সুমিত্রা।

সুমিত্রা অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, বেশ তো লোক তুমি! আপিস থেকে ফিরে না খেয়ে-দেয়েই গল্প জুড়েছ! উমানন্দকে বলি, খাবার দিক।

অসিত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তাহা হইলে তাহাদের আলোচনা সুমিত্রার কানে যায় নাই।

সবটা যায় নাই, শেষের কথা কয়টি গিয়াছিল।

সমস্যার এমন একটা সহজ সমাধান হাতের কাছেই রহিয়াছে, অথচ তাহার একবারও খেয়াল হয় নাই! আশ্চর্য্য!

এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অসিত আবার বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু স্ত্রীর অবর্ত্তমানে তো আর কোন বাধা নাই! আর সে বাধা তো নিজের হাতেই সরাইয়া দিতে পারে।

আঘাত! আঘাত তো লাগিবেই। অসিতকে সে ভালবাসে, শুধু মেয়েমানুষে যেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, তেমনই ভাবে। কিন্তু

জীবনের বন্ধুর পথে বিনা ব্যথায় কোন কাজ সম্পন্ন হইয়াছে ? আর সে আত্মহত্যা করিবে শুধু প্রেমাস্পদকে সুখী করিবার জন্য। আঘাত সেখানে তুচ্ছ।

শুধু একটি কথা ভাবিয়া কূল-কিনারা মেলে না, অসিতকে সে বিনা দ্বিধায় ছাড়িয়া যাইবে কি করিয়া ? এই তিন বৎসর যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিয়া আছে, অসীম দুঃখের মধ্য দিয়া যাহার সন্নিধানে সে অপরূপ সুখ পাইয়াছে, এক কথায় তাহাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাইশ বছরের পরিচিত পৃথিবীকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে, কোন্ অজ্ঞাত দেশে ?

ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্য হইতে এতটুকু আলো দেখা যায় না। সে যদি বাঁচিয়াই থাকে, তাহাতেই বা লাভ কি ? হয়তো অসিত এখনও তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতেও যে বাসিবে, কে বলিল ? কবে কোন্ বিপুল অর্থের নিঃসন্তান অধিকারী বন্ধ্যা স্ত্রীকে চিরকাল ভালবাসিতে পারে ? একদিন যদি অসিতের প্রেম সে হারায়, তবে সে দোষ দিবে কাহাকে ? অসিত তো দেবতা নহে, মানুষ মাত্র।

তাহার চেয়ে আত্মহত্যা অনেক সোজা। অসিত শোকে অধীর হইবে, হয়তো বহুকাল শোকাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু সময় তাহার সহায়। আটাশ বছরের যুবক চিরদিন মৃতা পত্নীর স্মৃতি বুকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে না।

একদিন নববধূ আসিবে আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে। সেই মেয়েটিই একদিন অসিতকে সুমিত্রার শোক ভুলাইয়া দিবে। আরও বেশি করিয়া ভুলাইবে রায়-বংশের উত্তরাধিকারীর জন্মের পর। শুধু এইটুকুর আশাতেই তো সে এত শীঘ্র স্বেচ্ছায় চিরকালের মত অসিতকে ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছে।

হয়তো এক গভীর নিশীথে সুন্দরী নববধূকে বক্ষে লইয়া সহসা সুমিত্রার কথা মনে পড়িবে, ক্ষণিকের জন্য। হয়তো অসিতের দীর্ঘ দুই চোখ মুহূর্ত্তের জন্য ঝাপসা হইয়া আসিবে; তাহার পরে আবার ভুলিয়া যাইবে।

শুধু এই স্মৃতিটুকু যদি ক্ষণে ক্ষণে অসিতের ভবিষ্যতের রঙিন দিনগুলিকে দোলা দেয়, তাহাতেই সে খুশি। শুধু যেন অসিত তাহাকে একেবারে ভুলিয়া না যায়, চিরবিস্মৃতির অতল অন্ধকারে তাহার স্মৃতি লুপ্ত না হয়।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সুমিত্রা ডাকিল, ভগবান, আমাকে বল দাও, সাহস দাও।

যেন অনন্ত আকাশের এক কণা ধূলির জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। যেন তিনি সর্ব্বদাই পৃথিবীর শত কোটি নির্ব্বোধ মানুষের কাতর প্রার্থনা শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছেন।

৬

তখন ইউরোপের দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী সভ্য মানুষের অসভ্য বর্ব্বরতার দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া আছে, কখন কাহার পালা আসে কেহ জানে না।

অসিতের আপিস হইতে ফিরিতে আজকাল রাত হইয়া যায়, সুমিত্রা জানালার পাশে একাকী বসিয়া থাকে। সময় কাটে, অতি ধীরে—এত ধীরে যে মনে হয়, কাল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সুমিত্রা মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক দিন আগে দেবীচরণের অসুখের সময় নানা রকম ঔষধ আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটা মালিশের ঔষধ ছিল। গায়ে লেখা আছে "Poison", এবং নীচে একটা নরকপাল ও দুই টুকরা হাড়ের ছবি আছে। সুমিত্রা ভাল করিয়া নামটা

পাড়িয়া দেখিল। বিষই বটে। হয়তো খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নাও হইতে পারে, কিন্তু পুরা এক শিশি সেবনে এক সময় না এক সময় মৃত্যু আসিবেই। হয়তো অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু, কিন্তু সে যন্ত্রণা সহিবার শক্তি তাহার আছে।

রাত নয়টা বাজিয়াছে। অন্ধকারে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে একটিও তারা নাই।

ভবিষ্যৎ এই বর্ষণাকুল আকাশের চেয়েও অন্ধকার। অন্ধকার কালো মেঘের পশ্চাতে শুক্লা-দ্বাদশীর চাঁদ আছে, সহস্র কোটি তারার মালা আছে, কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ তাহার জন্য কি রাখিয়া দিয়াছে কে জানে?

স্বর্গ-নরক বলিয়া সত্যই কিছু আছে কি? যদি থাকে, তবে ভগবানের বিচারে আত্মহত্যার শাস্তি অনন্ত নরক। হোক না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

অথবা হয়তো মৃত্যুর পরপারে আছে অনন্ত বিস্মৃতি। যেখানে দেহাতীত আত্মা অনন্তকালব্যাপী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে, যেখানে এই ছোট পৃথিবীর সুখদুঃখ, আনন্দ-বিষাদ কিছুরই তরঙ্গ পৌঁছায় না।

সুমিত্রা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহার শেষ চিঠি, শেষ প্রণয়লিপি। বার-কয়েক পড়িয়া চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কি হইবে চিঠি দিয়া?

সহসা সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিল। এ কি করিতেছে সে? চিরকাল ধরিয়া শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে আত্মহত্যা মহাপাপ, সে শিক্ষা হঠাৎ ভুলিয়া গেল কেমন করিয়া?

যদি অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর রেখা পাইত! কিন্তু তাহার তমসাচ্ছন্ন জীবনের পথে একদিন যে আলো অসিত জ্বালিয়াছিল, সে

আলো আর জ্বলিল না, সে আলো আর জ্বলিল না, সে আলো আর জ্বলিল না—

সিঁড়িতে কাহার পায়ের শব্দ! অসিত আসিয়াছে। আজকের মত মাহেন্দ্রক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে, আর সময় নাই। হয়তো কাল আবার সময় মিলিবে। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি শিশিটা লুকাইয়া রাখিল।

অসিতের মুখ উজ্জ্বল। হয়তো কোন সুখবর আছে। হয়তো কারবারে লাভের অঙ্ক আশাতিরিক্ত মোটা হইয়াছে। কিন্তু সুমিত্রার তাহাতে কি আসিয়া যায়? নিঃসন্তান অসিতের উত্তরাধিকারীবিহীন রায়-বংশেরই বা তাহাতে কি আসিয়া যায়?

সুমিত্রা শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, খবর কি? এত খুশি যে?

অসিত স্মিত মুখে বলিল, সুখবর আছে।

সুখবর?

হ্যাঁ। আচ্ছা সুমি, আমাদের বংশের টাকার ইতিহাস তুমি জান?

জানি। তোমার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মদাস রায় প্রথম কারবার আরম্ভ করেন, তাই না?

তাই। তিনি পাঁচ পুরুষ আগে যে রায়-বংশের পত্তন করেছিলেন, পঞ্চম পুরুষে এসে তা শেষ হয়েছে। যে টাকার আরম্ভ তার থেকে, তাও শেষ হ'ল পঞ্চম পুরুষেই।

সে কি গো? তার মানে?

মানে কারবার ফেল পড়েছে।

সর্ব্বনাশ! মৃত্যুপথের পথিকের এসব কথায় এত অনাবশ্যক কৌতূহল সুমিত্রার কাছে একটুও আশ্চর্য্য ঠেকিল না।

সর্ব্বনাশ কোথায় দেখলে? কত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল,

ঝতে পারছ না? ছেলে চাচ্ছিলাম কেন? টাকার উত্তরাধিকারীর ন্যেই তো? সেই টাকাই যখন নেই, তখন ছেলেরও দরকার নেই। খেবর নয়?

সমস্ত ব্যাপারটা স্থমিত্রার মাথায় ঢুকিতেছিল না। ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, কি ক'রে কারবার গেল?

যেমন ক'রে অনেক কারবার গিয়ে থাকে। যুদ্ধের পড়তি বাজারে াল সামলাতে পারল না। সবই প্রায় গেছে, এ বাড়িটাও যাবে, হয়তো দনা মিটিয়ে হাজার-কয়েক টাকা হাতে থাকতে পারে, নাও থাকতে ারে।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা।

সহসা অসিত বলিল, আচ্ছা স্থমি, সেদিন পিসীমার সঙ্গে আমার যা থা হচ্ছিল, তার খানিকটা তুমি শুনেছিলে, না?

স্থমিত্রা মাথা নীচু করিয়া বলিল, হ্যাঁ।

কালো রঙের শিশিটা অনাদৃত অবস্থায় এক পাশে পড়িয়া রহিল।

স্থমিত্রা কহিল, এখন আমরা কি করব?

চাকরি জুটিয়ে নেব।—অসিতের কণ্ঠস্বর পরিতৃপ্ত, চিন্তালেশহীন।

কিন্তু তোমার ছেলে?

দরকার নেই। যে টাকা ভোগ করার জন্যে দরকার ছিল, তাই যখন নেই, তখন ছেলেরও দরকার নেই। শুধু তুমি চিরকাল আমার কাছে থাক, তা হ'লেই হবে।

বিস্মৃতি ও স্মৃতি

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

খুব জোরে ঝমঝম করিয়া নহে, টিপটিপ বৃষ্টি। সন্ধ্যার সময় এব একা বাড়ির মধ্যে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না, কিন্তু উপ নাই।

শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয় দেখিলাম, সাতাশে।

মনে হইল, আজ কত বৎসর ধরিয়া শ্রাবণের শেষ দিকে মনে হইয়াছে, বোধ হয় আজই শেষ বর্ষণ, ভাদ্র মাস আসিলেই শরৎকাল কাশফুলে ভরা, শিউলির রঙে শুভ্র শরৎ। কিন্তু পঞ্জিকায় ভাদ্র মাস হইতে শরৎ আরম্ভ হইলেও প্রকৃত শরৎ আসিতে গোটা ভাদ্র কাটিয় যায়। তাহার পর সহসা একদিন আবিষ্কার করি, শরৎ আসিয়াছে অবিরাম অশ্রুবর্ষণের পরে আকাশের চোখে হাসি ফুটিয়াছে।

আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, ত্রিশ বৎসর আগে যৌবন পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তবু এমনই দিনে মনটা কেমন আনন্দে ভরিয়া যায়, শহরে থাকিয়াও মনে হয়, কল্পনার চোখে শুভ্র কাশফুলের গুচ্ছ দেখিতে পাইতেছি, স্টেশন হইতে মেঠো রাস্তা ধরিয়া পূজার দিন কয়েক আগে গ্রামে আসিতেছি, পল্লী-প্রকৃতি তাহার বর্ণবৈচিত্র্যের সম্ভার লইয়া আমাকে সাদরে ডাকিয়া লইতেছে।

অবশ্য বুঝি, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে চোখ দিয়া শরতের সৌন্দর্য দেখিয়াছি, সে দৃষ্টির আর কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই। আমার যৌব বহু—বহু দূরের অতীতে বিলীন হইয়াছে, আমি এ জীবনের খেয়া পা

ইবার রাস্তা ধরিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রমাগত পিছনে ফিরিয়া দেখিতেছি, কিন্তু ঝাপসা দৃষ্টি আর বেশি দূর পৌঁছিতেছে না।

কয়টা দিনই বা আর বাকি! বাঙালীর জীবনে ষাট বৎসর বয়স বার্দ্ধক্যের প্রায় শেষ ধাপ, আর গুটিকয়েক ধাপ কোনও রকমে পার হইতে পারিলেই দীঘির শীতল কালো কাকচক্ষু জলে চিরদিনের মত বিশ্রাম লইতে পারিব। মৃত্যুর পশ্চাতে অন্ধকার ছাড়া আর কি আছে?

কিছুই নাই।

বাহিরে তাকাইলাম। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে রজনীতে পরিণত হইতেছে, বৃষ্টি থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। বিরক্ত হইয়া ক্যালেণ্ডারের দিকে আবার তাকাইলাম, যেন আমার দৃষ্টির ফলেই বর্ষা অবিলম্বে শরতে পরিণত হইবে।

সাতাশে শ্রাবণ।

ঠিক এক মাস আগে আমার ষাট বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সহসা মনে হইল, আজিকার দিনটিরও যেন আমার জীবনে কি বিশেষত্ব রহিয়াছে। মনে করিতে পারিলাম না, অনেক চেষ্টা করিয়াও না।

ষাট বৎসর এক মাস আগে এক পল্লীর নিভৃত কুঁড়েঘরে পৃথিবীর আলো অথবা কুঁড়েঘরের অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। তাহার পরে এত দিনে পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভিক্টোরীয় যুগ ছাড়াইয়া ষষ্ঠ জর্জের যুগে পড়িয়াছি। ডাঙায় রেলগাড়ি যে সময়ে অবাক হওয়ার বিষয় ছিল, সে সময় কাটিয়া এরোপ্লেনের যুগ আসিয়াছে। আর আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কথা যদি সত্য হয়, তবে আর কিছু দিনের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তরের মধ্যে দিয়া আকাশযান ছুটিবে, সমস্ত পৃথিবীটাকে নব্য মানবের হাতের মধ্যে আনিয়া।

কিন্তু, কিন্তু আমার জীবনে সাতাশে শ্রাবণ কি শুভদিন আনিয়াছিল ? ঠিক এমনই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ছায়াচ্ছন্ন ধরণী, এমনই টিপটিপ বর্ষণ, এমনই একটি দিনে আমার জীবনে কি ঘটিয়াছিল ?

বুঝিলাম, ষাট বৎসর বয়সকে অবহেলা করা চলে না। আমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল।

আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে তো অনেক জিনিসই ভুলিয়া যাওয়া উচিত। চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, অতি শিশুকালে যেসব কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই অবিকল মনে রহিয়াছে। ছাত্র-জীবনের অনেক আনন্দ, অনেক ব্যথা, তাহার খুব অল্প অংশই ভুলিয়াছি। তাহা ছাড়া, জীবনের কতকগুলি ঘটনা, যাহাদের নিঃশেষে ভুলিতে পারিলে বিনিময়ে আমার জীবনের দশটা বৎসর অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, এসবও মনে আছে ; শুধু মনে আছে নয়, কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া আমার বার্দ্ধক্যের শান্তিময় জীবনকে অসহনীয় করিয়া তোলে।

চাকর আসিয়া তামাক দিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে অন্যমনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছি ; ছেলেটির বিবাহ দিয়াছি, তাহারও ছেলেমেয়ে হইয়াছে। বড় মেয়েটির তো প্রায় নিজেরই ঠাকুরমা হওয়ার বয়স হইল। দুই বছর আগে ছোট মেয়েরও বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি ; চিন্তা করিবার মত বিশেষ কোন বিষয় আর অবশিষ্ট নাই।

গৃহিণীর পঞ্চাশ বৎসর উতরাইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার দিনরাত্রির চিন্তা ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকাল। আমার দিকে নজর দিবার সময়ও বোধ হয় আর বেশি নাই। প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিলে অবশ্য মিথ্যা

কথা বলা হয়। কারণ বৃদ্ধবয়স মানুষের দ্বিতীয় শিশুকাল; একজন অভিভাবক না থাকিলে পদে পদে অস্বস্তি বোধ হয়।

অবশ্য গৃহিণী আমার জন্য একজন অভিভাবক ঠিক করিয়া দিয়াছেন। চাকর উমেশ আমার উঠা, বসা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো, সমস্ত জিনিসের তদ্বির করে, এবং এসব সে বোঝেও ভাল। যদিও সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার মত বৃদ্ধ আমি এখনও হই নাই।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু আসিলেন। উমেশ আর একটি গড়গড়া দিয়া গেল।

বন্ধু কলিকাতার এক বেসরকারী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি জগৎকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এবং গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বাহিরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। সঙ্গদোষে আমিও আমার অবৈজ্ঞানিক মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছি। বর্ষার আকাশের দিকে তাকাইয়া কোন নিবিড়কুন্তলা তরুণীর কথা মনে হইলে মনকে চোখ রাঙাই, শীতের শিশির যখন পত্রহীন গাছের ডালে ডালে মুক্তাহার সৃষ্টি করে, তখন বন্ধুর কথা মনে করিয়া সার্‌ফেস টেন্‌শন দিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।

অবশ্য সব সময়ে যে সফল হই, তাহা নহে। কারণ আমার মনের মধ্যে কোনও অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক লুকাইয়া নাই। সাদা চোখে যাহা দেখি, তাহাকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া সুন্দর করিয়া তোলা আমার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। তাই এত শিক্ষা সত্ত্বেও পদ্ম দেখিলে প্রভাত-রবির প্রিয়া বলিয়াই মনে হয়, গোলাপের রক্তরূপ রূপসীর ওষ্ঠাধরকেই স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ করিবার কথা মনে আসে না।

বন্ধু আমাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি জানি,

আমাদের পথ ভিন্ন, এবং আমার পথই বৃহত্তর সফলতার পথ, বিজ্ঞানের নানা কূটতর্কের অলিগলিপূর্ণ গোলকধাঁধা নয়।

বলিলাম, আমার স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে।

আমার মুখে এতবড় সংস্কৃত কথা শোনা বোধ হয় বন্ধুবরের অভ্যাস ছিল না, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, এতবড় কথাটা মনে রাখতে পারা তো স্মৃতিবিভ্রমের লক্ষণ নয়! তার চেয়ে সোজা কথায় বল, মাথার দোষ দেখা দিয়েছে।

সবিনয়ে জানাইলাম যে, সে রকম কোনও অঘটন যদি ঘটিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাতে। আপাতত এই সাতাশে শ্রাবণ তারিখের রহস্যটা উদ্ঘাটন করিতে না পারায় যে সামান্য একটু মাথা-গরম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্য।

বন্ধু কহিলেন, কাব্য পড়া ছাড়, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু থার্মোডিনামিক্স শিখবে?

সভয়ে কহিলাম, না না, আজ থাক, আর একদিন হবে। তা ছাড়া স্মৃতিভ্রংশই যখন হইয়াছে, তখন মিছামিছি পড়িয়া লাভ কি?

আমার ঘরে ও বাহিরে দুই দিকেই সমান বিপদ। গীতা, চণ্ডী, মোহমুদ্গর প্রভৃতি আত্মার উন্নতিকর গ্রন্থাবলীর দিকে আমার রুচি না থাকায় গৃহিণী বিরূপ, এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি প্রভৃতি আধিভৌতিক ভোজবাজির বিদ্যায় রুচিহীনতার জন্য বন্ধু বিরূপ। বন্ধু ও গৃহিণীর পাঠ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনও রকম বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ নাই; বন্ধু নাস্তিক, গৃহিণী পরম আস্তিক। শুধু এক জায়গায় তাঁহারা একমত, কাব্য ও কবিতার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে।

আমার সাহিত্যিক রুচি শুধু আমার ছোট মেয়ে শীলার প্রীতিকর। কিন্তু সে এখন অনুপস্থিত, এবং আমি আমার শিবিরে শত্রুবেষ্টিত।

অথচ গৃহিণী চিরকাল এরূপ ছিলেন না। তিনি শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, ইংরেজী বিশেষ না জানিলেও সংস্কৃত-জ্ঞান বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশ, যে বয়সে মেঘদূতের চেয়ে মোহমুদ্গর অধিকতর প্রীতিপদ, অভিজ্ঞানশকুন্তলমের চেয়ে গীতা-ভাষ্য অনেক বেশি মধুর।

বন্ধু কহিলেন, কই, দেখি তোমার মেমারি কি রকম খারাপ হয়েছে! জিওমেট্রির উনত্রিশের থিওরেমটা বল তো।

মনে হইল, স্মৃতিভ্রংশের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর পাইব না। কারণ উনত্রিশের থিওরেম যে মনে নাই, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আরম্ভ করিবামাত্র সমস্ত প্যারাগ্রাফটা গড়গড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল; কোথাও বাধিল না, কমা-সেমিকোলন পর্য্যন্ত না। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

বন্ধু খুশি হইয়া গড়গড়ার নলটা মাটিতে ফেলিয়া কহিলেন, এক্সেলেণ্ট! কোন্ হতভাগা বলে, তোমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে? তুমি ঠিক আছ।

কিন্তু সত্যই কি ঠিক আছি? মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পৃথিবী হইতে স্যূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল, ঠিক মনে আছে। পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, তবে উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা, তাহাও মনে রহিয়াছে। এমন কি স্যূর্য্যের নিকটতম গ্রহ বুধ, এবং সুদূরতম গ্রহ নেপ্‌চুন, ইহাতেও ভুল হয় নাই।

তবে যত গোল কি ঐ সাতাশে শ্রাবণ লইয়া?

চাকর উমেশ আসিয়া কহিল, বাবু, আজ মা বলেছিলেন আপনাকে বেড়িয়ে ফেরার পথে একটা ফুলদানি আনতে; এনেছেন কি না জিজ্ঞেস করছেন।

বাহির হইতেই পারিলাম না, তার ফুলদানি! কিন্তু এইখানেই আর একটা স্মৃতিবিভ্রমের কথা মনে পড়িল। ফুলদানির কথা একেবারে মনে ছিল না।

কহিলাম, কেন, ফুলদানি তো একটা রয়েছে, সেটা কি হ'ল?

সপ্রতিভভাবে উমেশ কহিল, সেটা কাল আমার হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেছে।

চটিয়া কহিলাম, তবে আর কি, আমাকে উদ্ধার করেছ! তোমার মাইনে থেকে ও ফুলদানির দাম কাটা যাবে।

উমেশ হাসিয়া চলিয়া গেল। ও জানে, আমার যত তেজ সব মুখে; বাড়ির সমস্ত বাসনপত্র অণুপরমাণুতে পরিণত করিলেও তাহার বেতন হইতে এক পয়সাও কাটিবার সাহস আমার নাই।

কিন্তু গৃহিণীর আজই ফুলদানির কি প্রয়োজন পড়িল, এবং বিশেষ করিয়া আজই আমার স্মৃতিবিভ্রম আরম্ভ হইল কেন?

উপায়ান্তর না দেখিয়া তামাকটানিতে আরম্ভ করিলাম।

আর একবার অভয় দিয়া বন্ধু বিদায় লইলেন।

বৃদ্ধ হইয়াছি—এ কথাটা বোধ হয় কোন বৃদ্ধেরই প্রীতিপদ নয়, অন্তত বার্দ্ধক্যের প্রথম অবস্থায় নহে। হইতে পারে, আশি পার হইয়া লোকে নিজের বয়স লইয়া গর্ব্ব অনুভব করে, এবং সম্ভব হইলে আসল বয়সের সহিত গোটাকয়েক বৎসর বাড়াইয়াও দেয়। কিন্তু আমার বার্দ্ধক্যের মাত্র আরম্ভের যুগ। পারতপক্ষে নিজের বয়সের কথা ভাবি না, তাই সহসা যে বিস্মৃতির নিদর্শন আমার মনটাকে নাড়া দিয়া গেল, সেই কথা ভাবিয়া অকারণে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

যেন বয়সের কথা ভুলিয়া থাকিলেই বয়সও আমাকে ভুলিয়া থাকিবে; আমার মাথার চুল বরফের মত সাদা হইতে বিরত থাকিবে, আমার

দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইবে না, আমার মসৃণ মুখে কোনও রেখাপাত হইবে না। আশ্চর্য্য এই দুর্ব্বলতা!

এ বয়সের পরমতম আনন্দ ও চরম দুঃখ নিজের যৌবনের কথা চিন্তা করা। কিন্তু যে আনন্দের সহিত দুঃখের সংমিশ্রণ নাই, তাহা আনন্দই নহে, অন্তত মানুষের পক্ষে নহে। একা একা বসিয়া জানালার বাহিরে বৃষ্টির ক্ষীণ ফোঁটাগুলির দিকে তাকাইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

সেই তিন যুগ আগে যে তন্বী ষোড়শীকে ঘরে আনিয়াছিলাম, আজ সে বৃদ্ধা, তাহার বড় মেয়েরই প্রায় মাতামহী হওয়ার সময় হইয়াছে। আজ তাহাকে দেখিলে কেহ বলিবে না যে, একদিন এই লোলচর্ম্মা, ধর্ম্মমাত্রসম্বল বৃদ্ধা ষোড়শী কিশোরী ছিল, তাহার রূপের আলোয় একটি পল্লী-কুটীর আলো হইয়াছিল।

আয়নার দিকে তাকাইলে আমিই কি মনে করিতে পারি, আমার একদিন পঁচিশ বৎসর বয়স ছিল, চুলের রং ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ, মনে ছিল অফুরন্ত তারুণ্য? আমার পেশীবহুল দেহ শিথিল হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমি সামান্য একটু বৃষ্টির জন্য এই সন্ধ্যা একা বসিয়া ঘরে কাটাইতেছি!

১৯০৩ সাল ও ১৯৩৮ সালের ব্যবধান তো কম নহে।

আচ্ছা, এমন যদি সম্ভব হইত যে, বিজ্ঞানের প্রভাবে গোটা-কয়েক বছর আগের যুগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইত! বেশিদিনের ব্যবধান নহে, কালিদাসের যুগে উজ্জয়িনীতে যাওয়ার বাসনা আমার নাই, আমাকে শুধু ১৯০৩ সাল ফিরাইয়া দাও—আমার পঁচিশ বৎসর বয়সে।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু শুনিলে পুনরায় আমার মস্তিষ্কবিকৃতির

সম্ভাবনা সন্দেহ করিতেন। কিন্তু বন্ধু, তোমরা বিজ্ঞানের বলে সমস্ত দুনিয়া হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছ, দূর দেশের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করিয়াছ। বিজ্ঞানের বলে তোমরা আকাশের বিদ্যুৎকে ক্রীতদাস করিয়াছ, প্রকৃতির সহিত মানবের মাতা-পুত্র সম্বন্ধ নষ্ট করিয়া প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছ। বৈজ্ঞানিক, তোমার শক্তি কতটুকু? অণুবীক্ষণের সাহায্যে অণুপরমাণুর রূপ দর্শনই কি তোমার বৃহত্তম জয়? না, দূরবীক্ষণ দিয়া দূর আকাশের তারা দেখিয়া নানারূপ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখাই তোমার চরম সাফল্য?

আমি রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া মণিমাণিক্যের মেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার অজ্ঞতায় কৃপার হাসি হাসিয়া জানাইয়াছ, যাহাদের মণিমাণিক্য বলিয়া ভুল করিতেছি, তাহারা সূর্য্য, আমাদের সূর্য্যের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল। শরৎ-রজনীতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া আমার প্রেয়সীর মুখ মনে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্না-ধবল ধরণীর রূপ দেখিয়া আমি বিস্ময়ে আনন্দে আকুল হইয়াছি, তুমি চোখে আঙুল দিয়া জানাইয়াছ, চাঁদ জীবিত নহে, কোন রূপসী তরুণীর সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই। চাঁদ শুধু কতকগুলি আগ্নেয়গিরির সমষ্টি, মৃত, শুষ্ক, বায়ুহীন। সূর্য্যের কাছে ধার করিয়া তাহার আলোর রূপ, নিজে সে অন্ধকার, কুশ্রী।

বৈজ্ঞানিক, তুমি আমার কাব্যের জগৎ, রূপের জগৎ রূপহীন করিয়াছ, রূপকথার জগতে অবিশ্বাস আনিয়াছ। আর কোনও দিন দূর তেপান্তরের মাঠে অচিন দেশের রাজপুত্র রূপকথার রাজকন্যার সন্ধানে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিবে না, তোমার এক মুহূর্ত্তের ক্রূর অবিশ্বাসের হাসিতে তুমি অকাতরে তাহার মৃত্যু আনিয়াছ। নিদ্রিত মণিহর্ম্ম্যে রাজকন্যার ঘুম কোনও দিন ভাঙিবে না, সোনার কাঠি রূপার কাঠি

অনাদৃত পালঙ্কের এক কোণে পড়িয়া রহিবে। তুমি জীবন আনিতে পার নাই, আনিয়াছ মৃত্যু ; কল্পনা আনিতে পার নাই, আনিয়াছ বাস্তব

কিন্তু শক্তিহীন বৈজ্ঞানিক, আমিও তোমাকে কৃপার পাত্র ভাবিতে পারি। তুমি দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরের নক্ষত্র দেখিতেছ, অচিন্ত্যনীয় দূরদেশে অদৃশ্য নীহারিকাপুঞ্জ আবিষ্কার করিতেছ ; কিন্তু পার তুমি, তোমার প্রাণহীন বিজ্ঞানের পুঁথির শুষ্ক হিসাবের অঙ্ক লইয়া ঐ সব জ্যোতিষ্কের যাত্রী হইতে ? কোন দিনও না, তুমি শুধু দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, আর নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া লজ্জা পাইবে।

আমি আমার কল্পনার আরোহী হইয়া রাত্রির আকাশের তারার তীর্থযাত্রী হইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি ; ছায়াপথের ধারে ধারে কালপুরুষ সপ্তর্ষিমণ্ডল পার হইয়া ধ্রুবতারার গণ্ডি ছাড়াইয়া বহু দূরে, যেখানে তোমার দূরবীক্ষণের দৃষ্টি পৌছায় না, সেই সব পথের পথিক হইয়াছি। পূর্ণিমার রাত্রিতে ডায়ানার সহিত ওরায়নের মিলন দেখিয়াছি, চুপিচুপি অলক্ষ্যে তাহাদের প্রণয়বাণী শুনিয়াছি।

সেই কল্পনাই আমাকে আমার যৌবন ফিরাইয়া দিয়াছে। বর্ষণ-ব্যাকুল ধরণীর অশ্রু মুছাইয়া শরৎ যখন পল্লীতে পল্লীতে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছে, এমনই সময় আমার গ্রামে ফিরিয়াছি।

ধানক্ষেতের মাঝে আল বাহিয়া আমি চলিয়াছি বাড়ির পথে। ষষ্ঠীর প্রভাত। রাত্রি সবে শেষ হইয়াছে। বনপথের মধ্যে গাছ হইতে বড় বড় শিশিরের ফোঁটা আমাকে ভিজাইয়া দিল, প্রবাসী সন্তানের গৃহাগমনে পল্লীমায়ের আনন্দাশ্রু। পূব আকাশে সূর্য্য উঠিতেছে, সোনার রঙে চারিদিক রাঙা হইয়া উঠিল, আসন্ন পূজার আনন্দে আমার মনকেও উতলা করিয়া।

বাড়ির বাহিরের পুকুরঘাটের পাশ দিয়া চলিতেছি ; ওপারের কয়েক-জনকে দেখা যাইতেছে। পথে লোক দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া ভাবিতেছে, কে আসিল !

সানাইয়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। আমি বাড়ি আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমার সাতপুরুষের ভিটা, আমার তীর্থ।

কিন্তু এ তো পঁচিশ বৎসরের যুবকের চিন্তা। আমি যদি আজ ষাট বৎসর বয়সে সেখানে যাই, আমার চোখে এসব কেমন লাগিবে ?

আমি জানি, আমার এ চিন্তা অপরিবর্ত্তনীয়। এক ষষ্ঠীর প্রভাতে আমার গ্রাম যাহাকে সমাদরে কোলে টানিয়া লইবে, সে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ নয়, পঁচিশ বৎসরের যুবক এবং সে যুবক আমি। বাহির হইতে তোমরা দেখিবে এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের কল্পনায় তাহার কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ হইয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের পেশীসবল সামর্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে।

শুধু একটি দিনের জন্য, যে ভগবানকে কোন দিন মানি নাই, তাঁহারই কাছে প্রার্থনা জানাইয়া রাখি। এক এক পা করিয়া যে শেষের দিনটি আগাইয়া আসিতেছে, সে যখন অবশেষে আসিয়া পৌঁছিবে, তখন যেন এই গ্রামেরই ভৈরবের পারে আমার পূর্ব্বপুরুষদের শ্মশানে, যে দেহটাকে এতদিন ধরিয়া নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া ভাল-বাসিয়াছি, চিতার আগুনে তাহার শেষ হয়। অন্তিম দিনে এই হইবে আমার শেষ ইচ্ছা।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। উমেশের ডাকে জাগিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ?

উমেশ সবিনয়ে জানাইল, মা বললেন, আজ রাত্রে খেতে একটু দেরি হবে।

আশ্চর্য্য, রাগ করিতে পারিলাম না। যদিও ঘড়িতে নয়টার বেশিই হইয়াছে, এবং আমার নয়টার মধ্যেই খাওয়া অভ্যাস, তবু কেন যেন মনে হইল, ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সংক্ষেপে বলিলাম, আচ্ছা।

উমেশ একটু অবাক হইয়া চলিয়া গেল।

বোধ হয় আজকের দিনটারই কোনও গুণ রহিয়াছে। না হইলে এতক্ষণ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, প্রথম যৌবনের স্মৃতি বেদনা অপেক্ষা আনন্দ বেশি দিল কি করিয়া ? আর যে বয়সে মৃত্যুর চিন্তার মধ্যে একটা অজ্ঞাতের আশঙ্কা ছাড়া কিছুই নাই, সেই বয়সে অনায়াসে কোন্ শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইব, তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি করিয়া ?

হয়তো বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সন্দেহই ঠিক; আমার বোধ হয় মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। আচ্ছা, তাই যদি হয়, তাহাতে আপত্তির কারণ কি আছে ? প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমি যে সব চিন্তায় অথবা ঘটনায় শুধু রাগ করিয়া বা ভয় পাইয়া থাকি, আমার এ ধরনের অবস্থায় যদি তাহা শুধু আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারে, ভালই তো।

কিন্তু সাতাশে শ্রাবণের রহস্য ভেদ করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী হয়তো জানিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে আমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হইল কোথায় ? তাহা ছাড়া, হয়তো গৃহিণী এখন কোন নূতন সংস্করণের গীতা, অথবা চণ্ডী, অথবা ঐ ধরনের কোন বইয়ে

আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া আছেন। আমার অনধিকারপ্রবেশে খুব খুশি না হওয়াই সম্ভব।

বাহিরে এখনও একই ভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে।

বাড়িতে নাতি-নাতনীদের কেহ উপস্থিত থাকিলে এতটা একা একা লাগিত না। কিন্তু ছেলে এলাহাবাদে ও মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি, এবং আমি এই বাড়িতে একা, যদিও গৃহিণী উপস্থিত আছেন।

কিন্তু যে সময় একা মালতী থাকিলেই নির্জ্জনতার সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া যাইত, সে সময় আর নাই। এখন হয়তো 'মালতী' বলিয়া ডাকিলেও কেহ ডাক শুনিবে না, কারণ সেদিনের মালতীর আজ একান্ন বৎসর বয়স, তাহার সঙ্গী গীতা প্রভৃতি আত্মার উন্নতিকর গ্রন্থ।

পণ্ডিতেরা নাকি বলিয়াছেন, ধর্ম্মাচরণ সস্ত্রীক করাই কর্ত্তব্য। এ ক্ষেত্রে স্বামীর যখন ধর্ম্মের বালাই নাই, এবং স্ত্রীর যখন ইহকাল অপেক্ষা পরকালের চিন্তাই প্রধান, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহার একাই সম্পাদন করিতে হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ, শেলি এবং কালিদাস, ইঁহাদের সাহচর্য্যে দিন কাটানো ছাড়া আমার উপায় নাই।

অথচ যখন সাতাশ বৎসর বয়সে এই মালতীকে লইয়াই উত্তর-কলিকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে দুইখানি ঘর লইয়া সামান্য বেতন সম্বল করিয়া নীড় বাঁধিয়াছিলাম, তখনকার মালতী কেমন ছিল? সারা-দিনের পরিশ্রমের পর যে মুখখানি দেখিয়া সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়া যাইতাম, এই কয় বৎসরে তাহার এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল?

আজ আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবসর লইয়াছি, আমার অফুরন্ত সময়, সপ্তাহের সাতটি দিনই রবিবার। এমনিধারা ছুটি আর কয়টি বৎসর আগে পাইলে কাহার কি আসিয়া যাইত?

কিন্তু আজ আর সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। রূপকথার রাজকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙিয়াছিল, অচিন দেশের রাজপুত্রের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়াছিল। রূপকথার এইখানেই শেষ। আমার রাজকন্যার গল্পের শেষ এইখানেই নয়। রাজকন্যার বয়স বাড়িয়াছে, তরুণী রাজকন্যা বৃদ্ধা হইয়াছে। রাজপুত্রের ভ্রমরকৃষ্ণ চুল সাদা হইয়াছে, কাহারও যৌবনের কণামাত্র অবশিষ্ট নাই।

এ রূপকথারও কিন্তু এখানে শেষ নয়। ইহার পরেও তাহার উপসংহার আছে, সে উপসংহার পুঁথির পাতায় নহে. ভৈরবনদের তীরে ক্ষুদ্র একটি শ্মশানঘাটে। কিন্তু তাহা হইলে রূপকথার সমাপ্তি হইল বিয়োগে, মিলনান্ত আর রহিল না।

আশ্চর্য্য, সামান্য একটা কথা মনে করিতে না পারায় অবান্তর কত কথাই যে মনে আসিতেছে! যেন ষাট বৎসরেই মানুষের জীবনের শেষ, সিঁড়ির শেষ ধাপ, সামনে যেন কালো জল ছাড়া আর কিছুই নাই। বন্ধুর কথামতই কাজ করিব, থার্মোডিনামিক্স পড়া ধরিব। তাহাতে জীবন-মৃত্যুর কথা নাই, সুখ-দুঃখের সমস্যা নাই, বিগত যুগের প্রেম মান-অভিমান কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু সে না হয় বন্ধু আসিলে চলিতে পারে; এখন রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি, ঘুম আসিতেছে, অথচ গৃহিণী অথবা উমেশ, কাহারও দেখা নাই। ভাবিতেছি, উঠিয়া গৃহিণীর ঠাকুরঘরে অনভ্যস্ত প্রবেশ করিয়া কারণটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব কি না। সাহস হইতেছে না।

একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী।

গল্পে পড়িয়াছি, ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে মরুভূমি সহসা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে, লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা তন্বী তরুণীর রূপ পাইয়াছে। আজ দেখিলাম, কিসের গুণে যেন গৃহিণীর অভ্যস্ত গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, হাতে জপের মালা নাই, আছে ফুলের মালা। এক মুহূর্ত্তের মায়ায় তাঁহার বয়স কমে নাই, কিন্তু প্রফুল্লতার ঔজ্জ্বল্যে তাঁহাকে সুন্দরী করিয়াছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, ব্যাপার কি?

উত্তরে গৃহিণী ফুলের মালাটি আমার গলায় পরাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সলজ্জ হাসিয়া কহিলেন, ভুলে গেছ? আজ সাতাশে শ্রাবণ।

আবার সেই সাতাশে শ্রাবণ! কহিলাম, সাতাশে শ্রাবণ কি?

গৃহিণীর প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। অভিমানের স্বরে কহিলেন, সাতাশে শ্রাবণ দশটা পনরো মিনিটের লগ্নে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। অবশ্য তোমার যদি মনে না থাকে, তবে মনে করিয়ে দিয়ে আর কি হবে?

সমস্যার এতক্ষণে সমাধান হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়, মনে ছিল বইকি, খুব মনে ছিল। দাঁড়াও দাঁড়াও, মালাটা তোমার গলায় পরিয়ে দিই।

গৃহিণীর অন্ধকার মুখে আবার হাসি ফুটিল। ঘড়িতে দশটা বাজিয়া ষোল মিনিট হইয়াছে।

রূপকথার রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়াছে। কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আমি আমার তিন যুগ আগের মালতীকে ফিরিয়া পাইয়াছি, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান যাহা কোনও দিনও দিতে পারে নাই, সাতাশে শ্রাবণের মায়ায় তাহা পাইয়াছি।

গৃহিণীর স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম,

"ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানে ছায়েব তরোর্মূলং ন মুঞ্চতি॥"

গৃহিণী হাসিয়া আমার চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

আশ্চর্য্য, এই দিনটির কথাই ভুলিতে বসিয়াছিলাম!

অনুভূতি

দুঃখ জিনিসটা যে উপভোগ করা যায়, এ কথাটা যেদিন আবিষ্কার করিলাম, সেদিন দুঃখের আর বেদনাবোধ রহিল না ; অথবা বেদনাবোধ রহিল, কিন্তু বেদনা উপভোগের উপকরণ হইয়া উঠিল।

আমার মনে হয়, আমি এই সত্যটি সবে সেদিন আবিষ্কার করিলেও ইহা চিরন্তন। কালিদাস হয়তো বিরহ-বেদনা তীব্রভাবে ভোগ করিয়া সহসা বেদনার অন্তরাল দিয়া সুখের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছিলেন মেঘদূত। যক্ষের বেদনা যে অমিশ্র বেদনা, তাহা কে বলিল ?

অবশ্য সব রকম দুঃখের বেলায় এ কথা বলা চলে না। কারণ এমন দুঃখ নিশ্চয় আছে, যাহাতে সান্ত্বনা নাই, যন্ত্রণার ক্ষণিক বিরামের অবকাশ পর্য্যন্ত নাই। আবার সেই সঙ্গে এমনও আছে, যাহা নিতান্ত শৌখিন, যাহার বাহিরের ছায়াধূসর আবরণের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল সুখ লুকাইয়া আছে। এই দুই জাতীয় বেদনার কথা বলিতেছি না। এমন একটি বেদনাও নিশ্চয় আছে, যাহা প্রকৃতই বেদনা, কিন্তু মনকে বিপরীত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সেই বেদনাকেই উপভোগ করানো যায়। আমার সাতাশ বৎসর বয়সের এ আবিষ্কার নিজের কাছে নূতন মনে হইলেও নূতন কিছুতেই নয়।

প্রায় মাস-খানেক আগে সুলেখার সহিত মনোমালিন্য হইয়াছে। সে সময়ে ভাবিয়াছিলাম, দোষ সম্পূর্ণ সুলেখার, আমি একান্ত নির্দ্দোষ। আজ এক মাস পরে সুলেখার কাছ হইতে ছিয়ানব্বই মাইল দূরে বসিয়া স্থান ও কালের ব্যবধানহেতু আগাগোড়া ঘটনাটি ভিন্ন দৃষ্টিতে

দেখিতেছি। পরিষ্কার বুঝিলাম, আমার অনর্থক জেদই এ অঘটনের মূল। স্থলেখার কোন দোষ নাই, ঔচিত্যের বাহিরে এক পাও সে যায় নাই।

বিষণ্ন হইলাম, এবং মুহূর্ত্ত পরে আবিষ্কার করিলাম, সেই বিষণ্নতা আমাকে নিছক বেদনা দান করিতেছে না। বিস্মিত হইলাম, কিন্তু বহু-আবিষ্কৃত সত্যের পুনরাবিষ্কার করিয়া খুশিও কম হইলাম না। এতদিন পরে মনে হইল, স্থলেখার সহিত ঝগড়া করিয়া অন্তত একটা সুফল ফলিয়াছে।

অষ্টমীপূজার দিন বেলা প্রায় নয়টার সময়ে। একই ফরাসে দুইটি ব্রিজের আড্ডায় ভগ্নহৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজিবার চেষ্টা বৃথা, কিন্তু কতকগুলি বয়স্ক লোক এই শিশুসুলভ—অন্তত আমার মতে—খেলা লইয়া দিনরাত্রি, দ্বিপ্রহর-প্রভাতের ব্যবধান ভুলিয়া যায় কি করিয়া, সে সম্বন্ধে মানসিক গবেষণা করিয়া আনন্দ আছে।

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কে যেন সত্রাসে এবং নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ করেছে, আমেজ মিঞা এসেছে, দই-মিষ্টিগুলো লুকানো আছে তো?

বোধ হয় যথোপযুক্তভাবে লুকানো ছিল না, তিন-চারজন শশব্যস্তে উঠিয়া বারান্দার পাশের অস্থায়ী ভাঁড়ার-ঘরের খাটের নীচে গোটা-কয়েক ক্যানেস্তারা এবং মাটির হাঁড়ি ভাল করিয়া ঠেলিয়া দিল। তাহার পরে ভালমানুষের মত আসিয়া ফরাশে বসিয়া খেলা দেখিতে আরম্ভ করিল, যেন আমেজ মিঞা, সন্দেশ ও রসগোল্লা, সবগুলি সম্বন্ধেই তাহারা সমান অনভিজ্ঞ।

কৌতূহলী দৃষ্টি উঠান পার হইয়া সদর-দরজার বাহিরে নিক্ষেপ

করিলাম, দেখিলাম, আমেজ মিঞা তখনও দরজার চৌকাঠ পার হয় নাই। চেহারার বৈশিষ্ট্য আছে, কাজেই বেশ খানিকটা দূর হইতেই নজরে পড়ে; তা ছাড়া, বয়সের আধিক্যহেতু মন্থর গতি।

উঠান পার হইয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিতে তাহার সময় লাগিল। কাছে আসিয়া একটি সেলামে প্রায় কুড়িজনের কাজ শেষ করিয়া নিস্পৃহ-ভাবে সিঁড়ির উপর বসিল।

এক বৎসর পরে আমেজ মিঞাকে দেখিলাম। এক বৎসরে যেন আরও অনেকখানি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যদিও পঞ্চাশের খুব বেশি বয়স নহে।

আমাদের ধানজমি চাষ করিয়া ফসলের একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া যাহারা বাঁচিয়া আছে, আমেজ তাহাদেরই একজন। ইহারা সকলে মোটামুটি অতি দরিদ্র। নির্লোভ নহে, কিন্তু সৎ। পল্লী-অঞ্চলে ভদ্রশ্রেণীর কলহ বিবাদ ও ষড়যন্ত্রের ধার ইহারা ধারে না। ধারিয়ে চলেও না। অপরিমিত পরিশ্রম, অর্দ্ধাশন ও ম্যালেরিয়া ইহাদিগকে অধিকাংশ বিষয়েই ভদ্রশ্রেণীর অনুগামী হইতে সাহায্য করে নাই। সুখাদ্য জিনিসটি কালেভদ্রে বাবুদের বাড়ির পূজাপার্ব্বণেই ইহারা পাইয়া থাকে, কাজেই দুর্গাপূজার কয়দিন যখন এই কদন্নভোজী, স্বাস্থ্যহীন, কৃষ্ণবর্ণ প্রাণী কয়টি সিঁড়ি হইতে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে উঁকি দেয়, তখন বড়বাবু মেজবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরের শিশুটি পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেও, আমার একটু অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু আমি বড়বাবু মেজবাবু ইঁহাদের কাহারও পদবী পর্য্যন্ত পদোন্নতি লাভ করি নাই, কাজেই ভাঁড়ার-ঘরের জিনিসগুলি যথেচ্ছা দ্বাদশ প্রেতকে বিলাইয়া দিবার অধিকারও হয় নাই।

অধিকাংশ সময়েই তাহাদের উঁকি মারাই সার হয়। পূজার দিনে

প্রার্থী কাহাকেও ফিরানো হয় না ; কিন্তু তুমি-আমি, বড়বাবু-মেজবাবু, আমরা কষ্ট করিয়া কলিকাতা হইতে পয়সা খরচ করিয়া ম্যালেরিয়ার দেশে গিয়াছি, আমাদের জন্য মিষ্টান্ন আসিয়াছে, তাহা অযথা খরচ করিলে চলিবে কেন ? ফিরাইয়া দেওয়া হয় না কাহাকেও, চিঁড়া, তরল দধি, গোটা-কয়েক নারিকেলের সন্দেশ, খুব বেশি হইলে একটি রসগোল্লা, ইহা দিয়াই এই রবাহূতদিগকে বিদায় করা হয়। তাহারা প্রতিমা নমস্কার করিয়া সানন্দেই চলিয়া যায়।

কিন্তু এই আমেজ লোকটি নাছোড়বান্দা। বাড়ির বর্ত্তমান যুগের বড়বাবু-ছোটবাবুদিগকে সে শিশুকাল হইতে দেখিতেছে, কাজেই খুব বেশি আমল দেয় না। তাহার রসনাসংক্রান্ত লোভ একটু অতিরিক্ত। কাহারও চোখে না পড়িলেও সে ক্যানেস্তারা দেখিলেই বুঝিতে পারে, তাহার মধ্যে কেরোসিন তেল আছে, না ঘি আছে, না বনগ্রামের কাঁচাগোল্লা আছে এবং ভাঁড়ার-ঘরে দধির ভাঁড় খাটের তলায় রাখিয়া চার-পাঁচখানি শীতলপাটি দিয়া খাটের নীচের ফাঁক ঢাকিয়া দিলেও তাহার শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

আমেজ লোকটি দেখিতে অত্যন্ত কুশ্রী। খুলনা জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সুরূপ হয় না, কিন্তু আমেজ তাহাদের সকলকে হার মানাইয়াছে। তাহার গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণ, লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। উদরের পরিধি অত্যধিক। সকলের উপরে বিরলদন্ত মুখ ও খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ দেখিয়া প্রথম হইতেই বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়।

এগারোটা প্রায় বাজে দেখিয়া স্নানের চেষ্টা দেখিতে খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থামের আড়ালে এতক্ষণ-অদৃশ্য আমেজও উঠিল।

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কারণ কালেভদ্রে যাহারা বাড়ি যায়,

তাহাদের সহিত দেখা হইলেই কুশল-প্রশ্নের পরের ধাপই হইল পয়সা চাওয়া। বলিলাম, কি হে আমেজ, খবর কি? ভাল তো?

আমেজ একটু বিষণ্ণ হাসিয়া বলিল, ভাল আর থাকি কি ক'রে বাবু, এক ভাবনা যাতি না যাতি আর এক ভাবনা আস্যে জোটে।

বলিলাম, সে আর নতুন কথা কি হ'ল? সকলেরই তাই।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে কথা কলি কি চলে বাবু, আমাগো ভাবনা অন্য রহম।

কথাটা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। স্নানের বেলা হইতেছিল, বলিলাম, তা তুমি বিকেলবেলা এস, তোমাকে কিছু দেব 'খন।

পল্লীর যে-কোন কৃষাণকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিবার ইহার চেয়ে ভাল ঔষধ আর নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, আমেজ খুব উৎসাহ দেখাইল না। শুধু স্বীকার করিল, বিকালে আসিবে।

সে ধীরমন্থর গতিতে চলিয়া যাইতেই দেখিলাম, কয়েকজন নিবিষ্ট-চিত্তে আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন। বলিলাম, আপদ গেল তো?

আমার সম্পাদক খুল্লতাত তাস রাখিয়া বলিলেন, গেল? গেল মানে? ও তো সবে এল।

আহা, এ রকম আসা তো রোজই আসে। আনা কয়েক পয়সা দিয়ে দেব 'খন বিকেলে, চুকে যাবে।

রাঙাদা বলিলেন, চুকে যাবে?

যাবেই তো। তোমাদের রসগোল্লা-সন্দেশের দিকে ও যতই নজর দিক, তাতে আমার হজমের ব্যাঘাত ঘটবে না। আমাকে আর না জ্বালালেই হ'ল।

মনে হইল, আমি কথাটাকে যত সহজে উড়াইয়া দিলাম, আর কেহ তাহা পারিলেন না। বড়দা খুলনা কোর্টে ওকালতি করেন, তিনি

বলিলেন, ওকে বেশি আশকারা দিও না। চেন না তো, শহরে থাক।

আশ্বাস দিয়া বলিলাম, নির্ভয়ে থাকুন, আমি ওকে আশকারা দিয়ে মাথায় তুলব না।

ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়িতে স্নানাহার করিতে দুইটা বাজিল। খানিকটা ঘুমাইয়া লওয়া চলিত, কিন্তু ভাবিলাম, ডাক্তারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিয়া দুপুরটা কাটাইয়া দেওয়া যাক।

ডাক্তার গ্রামেরই লোক, দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়; যশোহর মেডিক্যাল স্কুল হইতে পাস করিয়া নিজের বাড়িতেই ডাক্তারখানা খুলিয়াছে। ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরে যাহারা নিদ্রার শরণ লইতে ভালবাসে না, তাহারা এইখানে আসিয়া বসে। ডাক্তার গালগল্প করিতে পারে ভালই, এবং তাস খেলিতে জানে না। আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা ইহাই।

ডাক্তারের ঘরে আসিয়া দেখি, ডাক্তার হুঁকা হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতেছে। পায়ের শব্দে চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিয়া একবার দেখিল, কিন্তু গল্পগুজব সম্বন্ধে কোন উৎসাহ দেখাইল না। সম্ভবত মধ্যাহ্ন-ভোজনটা একটু গুরু হইয়া গিয়াছিল।

ডাক্তারের ঘরের পাশে তিনটি ভাঙা আলমারি সম্বল করিয়া গ্রামের লাইব্রেরি। অগত্যা একখানি বই লইয়া পড়িয়া দুপুরটা কাটানোর চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। কারণ দুপুরে আমার ঘুম আসে না।

বইটার দুই-তিন পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বুঝিলাম পড়া বই, এবং আমিই এককালে বইখানি লাইব্রেরিকে দান করিয়াছিলাম। তবু পাতা উল্টাইতে লাগিলাম এবং একই সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির মধ্যাহ্ন-উৎসব দেখিতে লাগিলাম।

শরৎকালের পল্লী-প্রত্যূষ খুব সুন্দর নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমার মনে হইল, দুপুর ও বিকালের মধ্যের সময়টুকু এই যোগেশ্বর ঔষধালয়ের বারান্দায় ভাঙা চেয়ারে বসিয়া উপভোগ করার মত শান্ত আনন্দ আর নাই। চোখের সামনে প্রখর রৌদ্র ও নিবিড় ছায়ার মধ্যে লুকাচুরি চলিয়াছে। পানাপুকুরের পাশে রাস্তা জনবিরল, ক্বচিৎ দুই-একটি লোক, একটা কুকুর, অথবা একটা গরু ছাড়া অপর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সেখানে নাই। পাশের আমবাগানে কি যেন একটা পাখী ডাকিতেছে, নাম জানি না, গলার স্বর মিষ্টি নহে; কিন্তু মনে হইল, শান্ত প্রকৃতির নিস্তব্ধতার নিবিড়ত্বের পরিচয় দিতে ঐ পাখীটিই পারিতেছে, সুকণ্ঠ কোন পাখী পারিত না।

গোটা-কয়েক পাতিহাঁস কোথা হইতে আসিয়া পানাপুকুরের উপর সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। আমি নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, রৌদ্র ও ছায়া, অসীম শান্তি ও ক্ষণিক অশান্ত পাখীর ডাক, হাঁসের ডানাঝাড়ার শব্দ। আর কিছু মনে রহিল না, কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত সুলেখা নামক যে একটি তরুণী সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া ছিল, তাহার কথাও না।

ডাক্তার ইতিমধ্যে চেয়ারে-বসা অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হুঁকাটা মাটিতে পড়িয়া, জল গড়াইয়া মাটির মেঝের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

ঠিক এমনি ভাবেই ঘণ্টা-তিনেক কাটিয়া গেল। অন্য দিন দুপুর-বেলা ডাক্তারের বাড়ি আড্ডাপ্রয়াসী অনেকের সমাগম হয়; আজ আর কেহ আসিল না। দেখিলাম, তাহাতে ডাক্তার ও আমার কাহারও অসুবিধা হয় নাই। ডাক্তার নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিয়াছে, আমি বিনা বাধায় মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির রূপসুধা পান করিয়াছি। যাহারা না

আসিয়াছে, তাহারা না আসুক, ভোজনস্নিগ্ধ দেহ লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা ফরাশে গড়াইয়া লউক, আমার আপত্তি নাই। এখন নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন আমার নাই।

কখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, খেয়াল করি নাই। ইতিমধ্যে ডাক্তারের ঘুম ভাঙিয়াছে, সে ভূপতিত হুঁকাটি লইয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া ঘুমঘোর কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাকাইয়া দেখিতেছিলাম। ডাক্তার গোটা-কয়েক টান দিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, হবে নাকি?

মাথা নাড়িলাম। আমি শহরের ছেলে, আমার কাছে সিগারেট আছে। একটা ধরাইয়া বলিলাম, এইবার বাড়ি যাই।

ডাক্তার বলিলেন, যাবে যাও। তার আগে ঐ লোকটির হাত থেকে বাঁচতে চাও তো চট ক'রে আমার কম্পাউণ্ডিং-রুমে ঢুকে পড়।

চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমেজ। হাসিয়া বলিলাম, ওর হাত থেকে পালিয়ে কত দিন বাঁচব? আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

আমেজ কিন্তু আমার সহিত প্রথমে কথা কহিল না। ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া বলিল, আর একড়া গুলি দেবা নাকি?

ডাক্তার প্রায় মুখ ভেংচাইয়া বলিল, দেবা নাকি? কুইনিনের গুলি বিনে পয়সায় আসে, না?

আমেজ একটুও অপ্রস্তুত হইল না। বলিল, তা মদ্যি মদ্যি দু-চারডে বিনে পয়সায় দেবা ছাড়া কি! তা আজ দ্যাও একড়া, পয়সা পাবানে।

পয়সা পাওয়ার আশা ডাক্তারের মুখে চোখে দেখা গেল না। সে গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া গিয়া শিশি হইতে স্বহস্তনির্ম্মিত একটি পিল বাহির করিল, অন্তত দশ গ্রেনের।

সবিস্ময়ে বলিলাম, অত বড় পিল?

ডাক্তার বলিল, এ তোমাদের শৌখিন জ্বর নয়, পাঁচ গ্রেনে আটকায় না।

তা না আটকাল, কিন্তু অত বড় গুলি গলা দিয়ে ঢুকবে কি ক'রে?

এইবার ডাক্তার একান্ত কৃপার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বলিল, ওর গলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চ'লে যায়, এ তো একটা কুইনিন পিল।

পিল লইয়া জলের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমেজ অক্লেশে গিলিয়া ফেলিল, একটু মুখবিকৃতি পর্য্যন্ত হইল না।

ডাক্তার চটিয়াই ছিল। এইবার বলিল, বুঝলে মণীশ, আমার পৌনে চোদ্দ আনা রুগীই এই রকম। এরা ওষুধকে মনে করে সন্দেশ-রসগোল্লা, কুইনিন-মিক্সচারকে মনে করে দই। খালি পয়সা দেবার বেলায়, হুঁঃ—

অর্থাৎ লোকগুলি এতই হীনচেতা যে, শুধু ডাক্তারকে জব্দ করিবার জন্যই বিনা পয়সায় খানিকটা বিস্বাদ ঔষধ গিলিয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঔষধের প্রয়োজন কিছু নাই।

ডাক্তার মুখ-হাত ধুইতে বাড়ির ভিতরে গেল। এতক্ষণে আমেজ কথা কহিল। বলিল, বাবু!

আমি নিঃশব্দে পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলাম।

সে সেদিকে তাকাইল না। বলিল, আপনার সঙ্গে গোটা-কতক কথা আছে।

কি কথা? একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। প্রায় অযাচিতভাবে যে পকেট হইতে চার আনা বাহির করিয়া দেয়, খানিকটা কৃতজ্ঞতা তাহার নিশ্চয় প্রাপ্য।

আমেজ বার-কয়েক ঢোক গিলিয়া বলিল, আমারে গোটা-পাচেক ট্যাহা দিতি পারেন?

নিতান্ত সুস্থদেহ লোক বলিয়াই বিস্ময়ে অচৈতন্য হইলাম না। কিন্তু এতই আশ্চর্য্য ঘটনা যে, বিস্মিত হইতেও ভুলিয়া গেলাম।

বলিলাম, পাঁচ টাকা? কি হবে? কোথায় পাব?

আমার শেষ প্রশ্নের জবাব সে দিল না। বলিল, উকিলবাবু বড় তাগাদা দিতিইলেন।

উকিলবাবু? মামলা শুরু করেছ নাকি? ওসব ঘোড়া-রোগ কেন?

সে লজ্জিত হইয়া বলিল, মামলা শুরু আর করব কোথাথে? ম্যায়েডা গলায় দড়ি দিইল—

নিজের অজ্ঞাতেই কহিলাম, গলায় দড়ি দিয়েছিল? ম'রে গেছে?

মলি তো ভালই হ'ত, মরিছে আর কই? বাচ্যেই আছে, আমারে দগ্ধে খাচ্ছে।

গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন?—বলিয়াই নিজের নির্বুদ্ধিতায় অবাক হইলাম। যেন পল্লীর নিরন্ন স্বাস্থ্যহীন সামর্থ্যহীন রমণী প্রণয়ঘটিত হতাশা লইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে!

জামাইডে বদ, ধর্য্যে ধর্য্যে মার দ্যায়, ম্যায়েডা তো পলায়ে পলায়ে আমার কাছে চল্যে আইছে কত বার। সেদিনে আমি মন্দ কইছেলাম, তাইতেই গলায় দড়ি দিইল।

বলিলাম, যাক, বেঁচে গেছে তো? তা হ'লেই হ'ল।

মনে হইল, কন্যার জীবিত থাকাটা আমেজের চক্ষে খুব সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়। বলিল, নিজে বাচ্যে গেছে, আমারে মারিছে। পুলিসের টানাটানি, খুলনেয় দোড়োনো, আর উকিলির পয়সা, এইতিই তো

গ্যালাম। সে সব তো চুকিছে, এহনে গোটা-পাচেক ট্যাহা না হলি তো আর উকিলির হাতেই মরি।

খানিকটা ভাবিয়া দেখিলাম। আমি মাসিক ষাট টাকা উপার্জ্জন করি, এদিক-ওদিক উঞ্ছবৃত্তি করিয়া আরও গোটা-কুড়ি টাকা পাই। বাবা বাঁচিয়া আছেন, বিবাহ করি নাই, কাজেই পাঁচটা টাকা দেওয়া খুব কঠিন নয়। দেওয়া হয়তো উচিতও। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ সিগারেটের খরচ বাড়িয়াছে, এক কথায় একটা কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলোদর, খর্ব্বকায় গ্রাম্য লোককে পাঁচটা টাকা দেওয়া চলে কি না ভাবিতেছিলাম। বলিলাম, তা বলতে তো পারছি না, তুমি কাল-পরশু নাগাদ এস, চেষ্টা করব।

এতক্ষণে তাহার কৃতজ্ঞতার নাগাল পাইলাম। সে কথা কহিল না, শুধু একটা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার দীপ্তিহীন দুই চোখ যে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, তাহা নজরে পড়িল।

নিজের অতি তুচ্ছ দুঃখটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিলাম। নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। দুঃখ জিনিসটার বিরাট দৃষ্টান্তের এত নিকটে আসিয়া আর স্থূলেখার কথা মনে রহিল না। জীবনের অল্প গোটা-কয়েক বৎসরের সীমারেখার অভ্যন্তরে যাহা সারা জগৎ বলিয়া ভাবিয়াছি, দেখিলাম, তাহার বাহিরেও জগৎ আছে। সে জগৎ সহসা নজরে পড়ে না, একবার পড়িলে তাহার বিশালতার কাছে নিজের জগৎ শূন্যে মিলাইয়া যায়।

বাড়ি ফিরিলাম। বড়দা রসিকতা করিয়া বলিলেন, কি হে, এবার কি কাণ্ড বাধিয়েছিলে? গত বারে তো পথ হারিয়ে সারা রাত বনবাদাড়ে

ঘুরে এলে। এবারে কি দুপুরবেলায় অন্ধকারে কিছু ঠাহর হ'ল না নাকি?

পাড়াগাঁয়ে পথ হারানো আমার একটা ব্যাধিবিশেষ—আমার অসংখ্য দুর্ব্বলতার একটি।

কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম অন্য কথা। বলিলাম, আচ্ছা বড়দা, আমেজের মেয়ের ব্যাপারটায় আপনি একটু তদ্বির করলে পারতেন। বেচারা গরিব মানুষ—

বড়দা জ্বলিয়া উঠিলেন। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, হারামজাদা তোমার কাছে লাগিয়েছে বুঝি? ছোটলোক তো! আমি বলি নি ওকে? ওই তো এর ওর তার পরামর্শ নিয়ে অন্য উকিলের কাছে মরতে গেল। মরুক ব্যাটা! মেয়ের বদলে ওই ঝুলে পড়ুক না!

কে যেন পাশ হইতে বলিল, হাতীবাঁধা দড়ি চাই। নইলে ছিঁড়ে যাবে।

আমেজ যে তাঁহার নামে কিছু লাগায় নাই, এ কথা বড়দাকে বুঝাইয়া দিলাম। কিন্তু তিনি বুঝিলেন কি না, তাহাই বুঝিতে পারিলাম না।

আমেজ কিন্তু দিন-কয়েক দেখা দিল না। পূজার ও বিসর্জ্জনের গোলমালে তাহার কথা মনেই ছিল না। আমার পুরাতন সাথী, অর্থাৎ সুলেখার সহিত মনোমালিন্য আবার ফিরিয়া আসিয়া মনের মধ্যে বাসা বাঁধিল। আমি বিষণ্ণ বদনে বিষাদ উপভোগ করিয়া চলিলাম।

সুলেখা ও আমার পরস্পরের সম্বন্ধে দুর্ব্বলতার খোঁজ আর কেহ রাখে না। রাখা নিরাপদও নয়, অর্থাৎ আমাদের দুইজনের দিক দিয়া। এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, আমরা নিজেরাই জানি কি না।

লক্ষ্মীপূজার দিন সকালবেলায় ছোট বোন আসিয়া খবর দিল, সুলেখাদি চিঠি লিখেছে।

চমকিয়া বলিলাম, কাকে? আমাকে?

সে পরম বিস্ময়ে বলিল, আহা, তোমাকে কেন, আমার কাছে লিখেছে। তোমার কথাও আছে, এই দেখ না।

সে সযত্নে চিঠির দুই পাশ ভাঁজ করিয়া মাঝের পাঁচ-ছয় লাইন দেখাইল; যেন বাকি লাইন-কয়টার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও কৌতূহল আছে। সুলেখা লিখিয়াছে—

> "—মণীশদা আমার 'পর খুব রাগ করেছে? না? তাকে ব'ল, আমি সেদিন রাগের মাথায় যা তা বলেছি, তার জন্যে সে যেন ক্ষমা করে। আমার ভারী মন খারাপ হয়েছে। এখানে এলে হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

বোন ভালমানুষের মত বলিল, এসব কি লিখেছে সুলেখাদি? তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বুঝি? বল নি তো! যাকগে, মা চিঠিখানা চেয়েছিলেন, দিইগে।

তাহার হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া তিন-চার টুকরা করিয়া পকেট রাখিয়া দিলাম, ভবিষ্যতের অগ্নি-সংস্কারের জন্য। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। সন্দেহ হইল, অরুণাকে যতটা ভালমানুষ ভাবি, ততটা সে নয়।

এতক্ষণে মনের মধ্যে হাতড়াইয়া দেখিলাম, যে দুঃখটাকে পরম যত্নে মনের মধ্যে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলাম, সুলেখার চিঠির ছয় লাইনের মন্ত্রবলে তাহা কোথায় উবিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত অসহায় বোধ করিলাম। দেখিলাম, একটি পোষা দুঃখ মনের স্বাস্থ্যরক্ষায় অনেকটা সাহায্য

করে। এখন তাহার একান্ত অনুপস্থিতিতে এবং আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে নিরুপায় হইয়া হাত-মুখ ধুইতে পুকুরপাড়ে রওনা হইলাম।

একটা আমের ডাল ভাঙিয়া দাঁতন করিতেছি, এমন সময় দূর হইতে দেখিলাম, আমেজ আসিতেছে। যে কারণেই হউক, সম্ভবত মন খারাপ হওয়ার কারণ মন হইতে দূরীভূত হওয়াতেই, তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, এখনও সাতটা বাজে নাই, ইহারই মধ্যে তাগাদা দিতে আসিয়াছে!

সে যে গত কয়েক দিন যাবৎ একেবারেই তাগদা দেয় নাই, সে কথা মনে পড়িল না।

কাছে আসিয়া নিঃশব্দে একটা সিঁড়ির ধাপের উপর বসিল। আমি সবেগে দন্তধাবন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমেজের মুখের উপর চোখ পড়ায় একটু অবাক হইলাম।

আমেজ আরও বুড়া হইয়া পড়িয়াছে, এই কয়দিনেই। গালের মাংস আরও ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু অধিকতর কোটরগত হইয়াছে। বলিলাম, জ্বর হয়েছিল নাকি?

সে ঘাড় নাড়িল। আমি মুখটা ধুইয়া লইলাম।

জ্বর হয় নি তো চেহারা ওরকম হয়েছে কেন?

সে একটু শ্রান্তস্বরে বলিল, ম্যায়েডা গলায় দড়ি দিইল।

অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, সে তো কোন্ হোসেনশার আমলে দিয়েছিল, সে কথা শুনতে চাচ্ছি না। ভাল কথা, তোমাকে পাঁচ টাকা দিতে পারব না, তিনটে টাকা পারি। চলবে?

কহিল, তাই দ্যান। ম্যায়েডা—

মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। বলিলাম, ম্যায়েডা—কি?

পরশু গলায় দড়ি দিইল, এবারে মরিছে।

মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। সহসা সানন্দে দেখিলাম, আমার একটি প্রিয় দুঃখ অন্তর্হিত হইলেও আর একটি নূতন পাইয়াছি। যথোপযুক্ত সহানুভূতি দেখাইলাম।

তিনটা নহে, পুরা পাঁচটা টাকা আনিয়া দিলাম। সিগারেট কমাইতে হইবে।

উত্তরাধিকারী

একাকী ঘরে বসিয়া স্তূপীকৃত কাগজপত্র সামনে রাখিয়া একখানি চিঠি পড়িতেছিলাম। চিঠির লেখক আমার ছোট ভাই, ঠাকুরদার নামে লেখা।

ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে গ্রামে আসিয়াছিলাম। ইহার আগে শেষ যখন আসিয়াছিলাম, সে অনেক দিন আগের কথা, তখন আমি যুবক। এ গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ি হইলেও গ্রামের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ অনেক দিন যাবৎ নাই, আজও সে সম্বন্ধ নূতন করিয়া পাতাইবার কোন প্রয়োজন দেখি নাই। তবু আসিয়াছিলাম, মৃত পিতামহের শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিতে।

ঠাকুরদাকে শেষ দেখিয়াছিলাম অন্তত পাঁচ বছর আগে। তখনই তিনি অতি বৃদ্ধ, প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়স। কলিকাতায় আসিয়াছিলেন চোখের চিকিৎসা করাইতে, আমার বাসাতেই উঠিয়াছিলেন।

যেন পঁচাত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধের চক্ষুরোগ একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, যেন সে চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া না পাইলে চলে না।

তাহার পরে তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক কিছু ছিল না বলিলেই চলে। খুব অল্প বয়সে বাবা-মা দুইজনকেই হারাইয়া কলিকাতায় পিসীমার বাড়িতে মানুষ হই। মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসিতাম, ঠাকুরদার সঙ্গে টাকার সম্পর্ক ছিল বলিয়া। মাসে অন্তত একখানি করিয়া চিঠি লিখিতাম, একই কারণে। তাহার পরে উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষীণ যোগসূত্রটুকুও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

আজ সেই সুদূরগত পিতামহের কথা মনে পড়িয়া মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। গ্রামে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁহার শেষ কয়েকটি বৎসর প্রায় নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে কোন দিন ভাবি নাই, অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গহীন জীবন কত বেদনাময়, কত দুর্ব্বহ! আজ তাঁহার মৃত্যুর পর বারে বারে সেই একই কথা মনে হইতে লাগিল।

আমার ছোট ভাই অসীমের জন্মের পরেই মা মারা যান। তাহার বছর-খানেক পরে বাবাও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। শুধু অসীমকে বুকে চাপিয়া বৃদ্ধ পিতামহ সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বিপুল স্নেহের কাছে আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমি ঠাকুরদার স্নেহের অংশীদার কখনও হইয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

আজ তাই মৃত বৃদ্ধের বহু বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত পত্ররাশি খুলিয়া দেখিতেছিলাম, বিগত যুগে নিজের লেখা কোন চিঠি পাই কি না। একখানিও পাইলাম না। সেসব চিঠির যেটুকু প্রয়োজন ছিল, অস্তিত্বও সেই সময়টুকুর জন্যই ছিল,—প্রয়োজন ফুরাইলেই তাহারা বাজে কাগজের ঝুড়িতে আশ্রয় লইয়াছে, আর তাহাদের সন্ধান কেহ লয় নাই। তা ছাড়া, প্রয়োজনও তো ছিল শুধু আমারই।

মনের মধ্যে হাতড়াইয়া এতটুকু অভিমান খুঁজিয়া পাইলাম না। যেখানে বন্ধন শুধু অর্থের, সেখানে স্নেহ-ভালবাসার খোঁজ করিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়, আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এটুকু আমি শিখিয়াছিলাম। আশা যেখানে বেশি, নৈরাশ্যের তীব্রতাও সেখানেই বেদনাদায়ক। আমার আশাও কিছু ছিল না, নিরাশও হইলাম না।

একরাশ কীটদষ্ট কাগজ ঘাঁটিয়া বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত দলিলপত্র সরাইয়া প্রথমেই হাতে পড়িল লাল ফিতায় বাঁধা এক তাড়া চিঠি, সংখ্যায় খুব বেশি নহে। বুঝিলাম, পিতামহ ও পিতামহীর যৌবনের চিঠি,

সেগুলি না খুলিয়া একপাশে রাখিয়া দিলাম। আরও অনেক কিছু পাইলাম, দশ-বারোখানি চিঠি বাবার লেখা, দুই-চারিখানি ঠাকুরদার কাছে মার লেখা। সঞ্চয়ী বৃদ্ধের পক্ষে এগুলির একখানিও ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কৌতূহলের বশে দুই-একখানি খুলিয়া সেগুলিও সরাইয়া রাখিলাম। মনে হইল, এতগুলি চিঠির মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার মত কিছু পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। আরও কয়েকখানি চিঠি পাইলাম, সকলের চেয়ে সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখা। তাহাতে শিশুহস্তের আঁকা-বাঁকা দুর্ব্বোধ্য চিঠি হইতে আরম্ভ করিয়া পাকা হাতের লেখাও নজরে পড়িল। সবগুলিই আমার ছোট ভাই অসীমের লেখা।

মাতৃহীন অনুজকে লোকে যেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, আমি অসীমকে তেমনি ভাবেই ভালবাসিয়াছিলাম। তবু, নিজের অজ্ঞাতে হয়তো একটু বেদনা, একটু ঈর্ষা অনুভব করিলাম। মনে হইল, আমার চিঠিগুলি কি এতই মূল্যহীন যে, বাজে কাগজের ঝুড়ি ভিন্ন তাহাদের স্থান হইল না, আর এ চিঠিগুলি কি এতই অমূল্য?

অথচ আমি জানি, সত্যই এগুলি অমূল্য। সোনারূপার দামে এ চিঠিগুলির দামের হিসাব-নিকাশ করা যায় না। তাহার কারণ শুধু এই নয় যে, অসীম পুত্রহারা পিতামহের শোক ভুলাইয়াছিল; ইহাও নহে যে, মায়ের কোল কাহাকে বলে তাহা সে কোন দিন জানিল না; অথবা আমি যখন পিতামহের সহিত শুধু অর্থের খাতিরে সম্বন্ধ রাখিয়াছিলাম, তখন সে তাহার হৃদয় দিয়া এই স্থবিরকে ভালবাসিয়াছিল, যে ভালবাসার একটি কণাও তিনি আমার নিকট হইতে পান নাই; কারণ তাহাও নহে।

কারণ এই,—অন্তত সবচেয়ে বড় কারণ—অসীম যে কোথায়,

তাহা আজ দশ বৎসর ধরিয়া কেহ জানে না। অতি সামান্য কারণে একদিন ঠাকুরদার উপর রাগ করিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল, আর কোন দিন তাহার উদ্দেশ মিলিল না। ঠাকুরদা ও আমি, উভয়েই যথেষ্ট টাকা খরচ করিলাম, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থানে অনুসন্ধান করা হইল, অসীমকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। নিঃসন্দেহ সে বাঁচিয়া নাই, বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিত—পিতামহের স্নেহের টানে।

এই একটি জায়গায় ঠাকুরদার সহিত আমার মিল ছিল—অসীমের উপরে অপরিমিত স্নেহে। আমার সে গোপন স্নেহের খবর ঠাকুরদা রাখিতেন না, রাখিলে হয়তো এত কঠোর হইতে পারিতেন না। আমার স্নেহ ঠাকুরদার স্নেহের মত প্রকাশ পাইত না, মনের গভীরতায় লুকাইয়া থাকিত; সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়, শুধু ঠাকুরদা নহে, হয়তো অসীমও সে স্নেহের কোন সংবাদ পায় নাই।

এমন কি আমিও হয়তো তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই, অসীমকে আমি কতখানি ভালবাসি। বুঝিলাম, যখন অসীম সকল স্নেহের অন্তরালে চলিয়া গেল—আমার ও পিতামহের নাগালের বাহিরে, তখন বুঝিলাম, যে স্নেহ আমি কখনও কাহাকেও বিলাইতে পারি নাই, ভাল করিয়া কাহারও কাছে পাইও নাই, সেই স্নেহ এই একটি অসহায় শিশু, যে জন্মাবধি ভাগ্যহীন, তাহাকেই ঘিরিয়া নিঃশেষ হইয়াছিল। কেহ জানিল না; সেও না, হয়তো আমিও না।

শুধু ভাবিয়া অবাক হই, অসীম নিরুদ্দেশ হওয়ার পরেও ঠাকুরদা এত দিন কেমন করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন! বোধ হয় সে একদিন ফিরিয়া আসিবে, এই আশাটুকু বুকে লইয়া আশি পার হইয়াও তিনি কোন রকমে জীবনভার বহন করিয়াছিলেন। এতবড় দুরাশা বোধ হয় কেহ

কোন দিন করে নাই। এত দিন পরে হয়তো তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পরপার হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না, কোন পরিজনের, কোন স্থবির বৃদ্ধের আকুল আহ্বান শুনিয়াও না।

অসীমের শেষ চিঠিখানি হাতে করিয়া অন্যমনস্কভাবে বসিয়া ছিলাম। মনে হইল, কি বিপুল স্নেহ এই রুক্ষতার আবরণে গড়া বৃদ্ধের মনের ভিতরে লুকাইয়া ছিল! আমার শৈশবে যাহার সংস্পর্শে আসিয়াও আসিতে পারিলাম না, তাহা পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইল অসীমের জন্মের পর। আমি তাহার ন্যায্য অংশ পাই নাই বলিয়া আর আমার দুঃখ ছিল না। যে সর্ব্বতোভাবে পাওয়ার যোগ্য বলিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, দিয়াছিলেনও তাহাকেই নিঃশেষ করিয়া। যে ভাইকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই তাঁহারও হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল, যদি হতভাগ্য অসীম তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ না করিতে পারিয়া থাকে, দুর্ভাগ্য তাহারই বেশি।

•

এ গ্রামকে ভাল করিয়া কোন দিনই চিনি নাই। খুব অল্পবয়সে শহরে আসিয়া সেখানেই মানুষ হইয়াছিলাম, গ্রামের প্রতি আমার খুব বেশি আকর্ষণ ছিল না।

কেবল ব্যতিক্রম ছিল অসীম।

হয়তো এমন কোন দিন ছিল, যেদিন গ্রামের সৌন্দর্য্য ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। আজ তাহার কিছু বাকি নাই। পুরাতন গৌরবের চিহ্ন রহিয়াছে তিন-চারিখানি বড় বড় বাড়ি, যেখানে বাসস্থান যথেষ্ট আছে, বাস করিবার মত মানুষ নাই। বছর দুই আগেও এমন লোক কয়েকটি ছিল, যাহাদের এই গ্রামের লোক বলা চলিত। এখন দুই-তিনটি পরিবার ভিন্ন আর কাহারও অস্তিত্ব তাহাদের মধ্যে বাকি নাই। শ্রীনাথ

চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ ঘোষ অল্প কিছু দিন হইল মারা গিয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহাদের দুই পরিবারের সহিত গ্রামের সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে।

ঠিক তেমনই করিয়া আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমিও বোধ হয় গ্রামের সহিত, আমার বহুপূর্ব্বপুরুষের ভিটার সহিত, এত দিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম। বাবা-মাকে ভাল করিয়া মনে নাই, কিন্তু অসীমের স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িতে একাকী কয়েক দিন থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

তবু এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট জনমানবহীন দেশে যে লোকটি আশি বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা ভাবিয়া আমার কঠোর চোখেও জল আসিল। কি সুখের আশায়, কি আনন্দের আশায় তিনি এই নিরানন্দের প্রতিমূর্ত্তি গ্রামে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিহীন শোকাচ্ছন্ন শেষ জীবন কাটাইয়া গেলেন? শুধু কি তাঁহার পিতৃপিতামহের ভিটার মায়ায়, না, শৈশবের খেলাঘর, যৌবনের কর্ম্মস্থল, তাহারই মায়ায়? না, এইখানেই তিনি নিজ হাতে অসীম নামে একটি অনাথ শিশুকে মায়ের অধিক স্নেহে যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন, তাহারই স্মৃতির মায়ায়?

অসীম যদি বাঁচিয়া থাকিত, বলিতাম, অকৃতজ্ঞ অসীম! বলিতাম, ওরে, তুই কোন্ ভ্রমের ঘোরে এমন স্নেহের বন্ধন কাটাইয়া দূরদূরান্তরে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিলি? এমন ঘরের টান তোকে যে বাহিরের টানের কাছে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, কি সে আকর্ষণ? কোন্ মৃগতৃষ্ণিকার মোহ?

কিন্তু অসীম তো আর বাঁচিয়া নাই।

যে লোকটির কথা প্রয়োজন ব্যতীত কখনও মনে পড়ে নাই, যিনি বাঁচিয়া থাকিতে দুই ছত্র লিখিয়া কুশলপ্রশ্নটুকুও করার প্রয়োজন অনুভব

করি নাই, আজ তাঁহার মৃত্যুর পক্ষকাল পরে তাঁহারই ব্যবহৃত ছোট ঘরখানিতে বসিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া সমস্ত অন্তর ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

ঠাকুরদাকে গ্রামের লোকে যে খুব শ্রদ্ধাভক্তির দৃষ্টিতে দেখিত, তাহা মনে হয় না। তাঁহার কৃপণতার অপবাদ ছিল, সে অপবাদ খুব মিথ্যাও বোধ হয় নহে। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশের সহিতই তাঁহার পরিপূর্ণ অসদ্ভাব ছিল, শুধু তাঁহারা সুযোগের অভাবে সে অসদ্ভাবের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু ঠাকুরদার মৃত্যুর পরে তাঁহারাই আমার নিকট মায়াকান্না কাঁদিয়া গেলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি মারা যাওয়াতে তাঁহাদের শোকের অবধি নাই।

যাঁহার সহিত ঠাকুরদার সবচেয়ে বেশি রেষারেষি ছিল, সেই হলধর রায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। কহিলেন, তোমার যে কি কষ্ট হচ্ছে, সেটা আমরাই বুঝতে পারছি। যাক, শোক ক'রে আর কি করবে বাবা, তিনি গেছেন, বয়স তো হয়েছিলই, ভালই গেছেন।

তিনি যে ভালই গিয়াছেন, সে বিষয়ে ইহাদের কাছে পাঠ লওয়ার দরকার আমার ছিল না। আমার কষ্ট হউক বা নাই হউক, তাহাতে তাঁহাদের উপদেশের কি প্রয়োজন, তাহাও বুঝিলাম না। তবু ভদ্রতা করিয়া কথার জবাব দিতে হইল, তাঁহারাও পরম পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার এখানকার কাজ মোটামুটি শেষ হইয়াছিল। স্থির করিলাম, একজন দূরসম্পর্কীয় দরিদ্র আত্মীয়কে গ্রামে আনিয়া বসাইব, তিনি আমার ও তাঁহার নিজের উভয়েরই স্বার্থের দিকে নজর রাখিবেন।

ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় হইলেও জমির ফসল জন্মানোর শক্তি কমে নাই, পাকা হাতে তাহার ভার থাকিলে আয় নিতান্ত কম হইবে না। টাকা আমার নিজের যথেষ্ট আছে, কিন্তু যথেষ্টকে যথেষ্টতর করার যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে, তাহা আমি জানিতাম।

এমন একান্ত বিষয়নিমগ্ন মনোভাব লইয়া আমি ঠাকুরদার দপ্তর দেখিতে বসিয়াছিলাম।

কিন্তু অসীমের কয়েকখানি চিঠি সব ওলটপালট করিয়া দিল। মনে হইল, কি জিনিসের আস্বাদন আমি এক কণাও পাইলাম না! খুব শৈশব ব্যতীত মা-বাবার স্নেহ আর পাই নাই। পিতামহের স্নেহ যখন একান্তভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা আসিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নূতন অংশীদার আসিয়া তাঁহার সমস্ত স্নেহ নিঃশেষে দখল করিয়া লইল, আমার কণামাত্রও জুটিল না।

মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তো অসীমই। আমার মায়ের কোল ছাড়িবার বয়স না আসিতেই সে আমার মাতৃস্নেহে ভাগ বসাইতে আসিয়াছিল। মাকে যে চিরদিনের জন্য হারাইলাম, তাহার জন্য তো দায়ী সেই! বাকি ছিল পিতামহের শূন্য ক্রোড়, কিন্তু অসীমের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আমার দিক দিয়া অর্গল পড়িল, আমি চিরকাল অবাঞ্ছিত, অনাহূতের মত বাহির-দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে দুয়ার কোন দিনও খুলিল না। আমারও করাঘাত করার সাহস বা প্রবৃত্তি রহিল না, রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিলেই তো আর প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না!

কিন্তু অসীমের সম্বন্ধে আমার কি এক দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, যাহাতে তাহার কোন দোষই আমি দেখিতে পাই না। শুধু এইটুকু ভাবিয়া ব্যথিত হই যে, আমার সে স্নেহের মূল্য সে কোন দিনই বুঝিল না।

নাই বা বুঝিল, আমি তাহাকে ভালবাসিয়াই সুখী, প্রতিদানের অপেক্ষা রাখিয়া তো তাহাকে স্নেহ দান করি নাই!

যাহাকে এত ভালবাসিতাম, এত দিনের ব্যবধানে তাহার স্মৃতিও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তাহাকে শেষ দেখিয়াছি নয় বছর আগে, বয়সে তখন সে প্রায় যুবক; নারীসুলভ অতি সুকুমার কচি মুখ, কোঁকড়া চুল, ফরসা রং, সমস্ত মিলাইয়া তাহার যে স্মৃতি এখনও মনে রহিয়াছে, তাহার সহিত বাস্তবের কতখানি মিলিবে জানি না। তাহার স্বভাব ছিল ভীরু লাজুক শিশুর মত। লেখাপড়ায় খুব ভাল সে কোন দিনই ছিল না, কিন্তু সে অভাব ঠাকুরদা অথবা আমি কোন দিনই বোধ করি নাই।

কেন জানি না, আমার সহিত সে কোন দিনই প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না। হয়তো আমার নীরস বাহির দেখিয়া সে ভুল করিয়াছিল, যেমন ভুল অনেকেই করিয়াছে; হয়তো যে বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় সে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার তুলনায় আমি ছিলাম নিতান্ত নগণ্য।

শুধু এক দিন সে আমার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা বলিয়াছিল। হয়তো সেখানে আমি ছিলাম উপলক্ষ মাত্র, সে নিজের মনের কথা নিজের কাছেই খুলিয়া বলিয়াছিল।

বলিয়াছিল, দাদা, আমার এসব আর একটুও ভাল লাগে না, পড়াশুনো আমার পোষায় না। দাদুর কাছে ফিরে যেতেও সাহস হয় না, মনে হয়, বাঁধা প'ড়ে যাব, আর বাইরে বার হবার পথ পাব না।

এসব কথার সহিত শেয়ার-মার্কেটের দাম ওঠাপড়ার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থকরী কোন বিষয়ের বাষ্পও ইহার মধ্যে নাই। আমি অন্যমনস্ক-ভাবেই শুনিয়াছিলাম, অন্যমনস্কভাবেই মনে রহিয়াছে।

আমার মনে হয়, ঠাকুরদার উপরে রাগ একটা অজুহাত মাত্র।

এতকাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া মুক্ত হাওয়ার টানে সে বাহিরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, অভিজ্ঞতার অভাবে অসংখ্য বিপদের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, বাঁচিয়াও হয়তো আর নাই।

কিন্তু এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কারণ যাহাদের মধ্যে স্নেহ, যাহাদের মধ্যে বিবাদ, তাহাদের একজন মৃত, এবং সম্ভব-অসম্ভব সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে আর একজনও মৃত। শুধু আমি জীবিত থাকিয়া নিরঙ্কুশ অবস্থায় বিষয়ের মালিক হইয়া পড়িয়াছি।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। ঘুম আসিতেছিল না। একজন তরুণ ও একটি বৃদ্ধের চিন্তা স্তব্ধতার মধ্যে নিঃশব্দ কলরবে আমাকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল।

সহসা খেয়ালের বশে আস্তে ডাকিলাম, অসীম! চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, রাত্রির অন্ধকারের মধ্য হইতে স্বল্পালোকিত ঘরে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, ঘরের বায়ুমণ্ডল, বাহিরের শূন্যতা সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অসীমের স্মৃতি মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে। আমার মনের ভিতর হইতে এক অশীতিপর বৃদ্ধের রূপ যেন খানিকক্ষণের জন্য মুছিয়া গেল। মনে হইল, অসীমকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছি,—দুর্ব্বল অসীম, ভাবপ্রবণ অসীম, কল্পনাবিলাসী অসীম, এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের খেয়ালে ঘর ছাড়িয়া কোন্ সুদূরে কোন্ সঙ্গীহীন সান্ত্বনাহীন প্রান্তরে তাহার জীবন শেষ হইল? আর যদি সে বাঁচিয়াই থাকে, তবে কোথায় কোন্ নগরের নিষ্করুণ রাজপথে সে একমুষ্টি অন্নের কাঙাল? যে বড় বেশি ভালবাসিত, তাহার স্নেহনীড় ছাড়িয়া হৃদয়হীন পৃথিবীর বুকে সে আজ কতখানি অসহায়?

আবার ডাকিলাম, অসীম, অসীম, অসীম! কেহ উত্তর দিল না,

শুধু নিস্তব্ধ রাত্রিতে আমার নিজের গলার স্বর, আমার মনের বেলা-ভূমিতে, অসংখ্য নগণ্য চিন্তার বালুকণায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

ভাবিলাম, আজ যদি সে ফিরিয়া আসিত, তবে একজনের অভাব নিজের হৃদয়ের স্নেহ দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতাম। হয়তো বিনিময়ে আমার বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, অর্থপিপাসু জীবনে আমিও কিছু পাইতাম, কারণ ভালবাসা এমন একটি জিনিস, যাহা সঞ্চয় করিয়া রত্নমঞ্জুষায় লুকাইয়া রাখা যায় না, নিঃশেষে বিতরণ করিয়াই তাহাকে ধরিয়া রাখা চলে।

আবার পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে লাগিলাম।

ঠাকুরদার সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে যাহা ধারণা ছিল, এখন দেখিলাম, তাহার পরিমাণ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি। ঠাকুরদা তেজারতী কারবার করিতেন। সামান্য টাকা বহুগুণে বাড়িয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমাকে প্রথমে স্তম্ভিত এবং পরে বিশেষ পরিমাণে তৃপ্ত করিয়া তুলিল।

অবশ্য আমার নিজের যে টাকার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। আমি নিজে যাহা উপায় করি, তাহার পরিমাণ খুব সামান্য নহে, এবং আমার পক্ষে তো নহেই। আমি বিবাহ করি নাই। জীবিত নিকট-আত্মীয় কেহ আছেন বলিয়া জানা নাই, থাকিলেও তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া, শুধু মানসিক নহে, শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও যাহা পাই, তাহার কাছে সহসা বিনাযত্নে বিনাপরিশ্রমে প্রাপ্ত এই অর্থ অত্যন্ত বিশাল বলিয়া মনে হইল।

শুধু একজন জীবিত থাকিলেই এই অবস্থায় অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত, সে অসীম। কিন্তু সহজ বুদ্ধি দিয়া বিবেচনা করিলে



বুঝি, তাহার পক্ষে এখনও বাঁচিয়া থাকা প্রায় অসম্ভব। যদি থাকিত, তবে এই দীর্ঘ নয় বৎসরে তাহার কোন খবরই কি পাইতাম না? অন্তত আমার তাহা মনে হয় না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিয়াছিল। ঘরে ঘড়ি ছিল না, জানালার বাহিরে আকাশের দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, প্রায় দুইটার কাছাকাছি হইয়াছে। ঘুম আসিতেছিল।

কিন্তু আজ এই দপ্তর শেষ না করিয়া ঘুমের কথা ভাবিব না। যে পিতামহকে কোন দিন ভাল করিয়া চিনি নাই, তিনি হয়তো একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই, আমার জন্য যে বিপুল অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে না হিসাব করিয়া মনে স্বস্তি পাইতেছিলাম না। হয়তো আর আমাকে জীবনে অর্থোপার্জ্জনের তৃষ্ণায় ঘুরিয়া মরিতে হইবে না, যেমন ভাবেই থাকি না কেন, যাহা পাইয়াছি হয়তো তাহাতেই আমার বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে।

আমার স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি সাধারণের হিসাবে একটু বেশি বড়।

একখানি বৃহৎ আকারের খাম হাতে পড়িল। উপরে কিছু লেখা নাই, শুধু শীলমোহর দিয়া বন্ধ করা।

পঞ্চতন্ত্রের গল্প পড়িয়াছিলাম, একজন তামার খনির সন্ধান পাইয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, বড় কিছু চাহিয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে মিলিল রূপার খনি, অবশেষে সোনার খনি, তাহাতেও তাহার আশা মিটিল না। আরও বড় কিছু পাইবার লোভে সে সম্মুখে চলিল, পরিণামে মিলিল মৃত্যু।

খামের মধ্যে একখানি উইল। সেই উইল অনুসারে ঠাকুরদা তাঁহার অস্থাবর নিজস্ব সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন অসীমের জন্য, আইন অনুযায়ী তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও ভাগ নাই।

স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মৃত পিতামহ, নিরুদ্দিষ্ট ভাই, ইহাদের জন্য সমস্ত মমতা, সমস্ত অনুকম্পা মনের মধ্য হইতে উড়িয়া গেল, বাকি রহিল শুধু সীমাহীন ক্রোধ ও ক্ষোভ। আমি যেমন ছিলাম তেমনই রহিয়াছি, এই বাড়ির ভিটাটুকু ও কয়েক বিঘা ধান-জমি ভিন্ন ঠাকুরদার কোন সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই, এতটুকু না।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলাম, এতটা মন খারাপ করার প্রয়োজনই বা কি? অসীমের যখন কোন উদ্দেশ নাই, এক আধ দিন ধরিয়া নহে, দীর্ঘ নয় বছর ধরিয়া, তখন তাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিয়া লওয়ায় কি বাধা থাকিতে পারে? আর সেইটুকু গোল মিটাইতে পারিলেই তো সব আমার, দ্বিতীয় অংশীদার আর কে আছে?

উইল তিন বছর আগের। অর্থাৎ এত দিনেও ঠাকুরদার মন হইতে এ বিশ্বাসটুকু যায় নাই যে, অসীম ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সে বিশ্বাসের মূল্য আজ আর একটুও নাই।

কিন্তু যে কারণেই হউক, কথাটা ভাবিয়া খুব খুশি হইতে পারিলাম না। আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ঠাকুরদা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, উইলের কোন স্থানে আমার নাম পর্য্যন্ত নাই।

মনকে বুঝাইলাম, নাই বা থাকিল। পরিণামে ফল তো একই দাঁড়াইতেছে। ও উইলের মূল্য কি আছে? অসীম যদি বাঁচিয়া থাকিত, ও সম্পত্তি দখল করিয়া লইতে ফিরিয়া আসিত, তবে না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সত্যই কি সে সম্ভাবনা কিছু নাই? এমনও তো হইতে পারে, অসীম বাঁচিয়া আছে, একদিন সহসা ধূমকেতুর মত আসিয়া আমার আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন এক মুহূর্ত্তের রূঢ় সত্যের আঘাতে ভাঙিয়া দিয়া যাইবে।

অসীমের জীবনান্ত সম্বন্ধে আমার এত দিনের দৃঢ় বিশ্বাসের মূল যেন শিথিল হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্য, এক টুকরা কাগজের এতখানি ক্ষমতা!

আমার নিদ্রার সমস্ত বাসনা চলিয়া গিয়াছিল। তবু জোর করিয়া ঘরে গিয়া বিছানা আশ্রয় করিলাম। ঘুম আসিল না।

অল্প তন্দ্রার ঘোরে আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কাগজপত্রের ঘরে কে যেন চলাফেরা করিতেছে, কি যেন খুঁজিতেছে। মনে হইল, ঐ লোকটাই অসীম, আর যাহা খুঁজিতেছে, তাহা ঠাকুরদার উইল।

আমি ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া আবার দপ্তর-ঘরে আসিলাম। একটা সিগারেট ধরাইয়া চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

উইলখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলাম। বাংলায় লেখা, তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ। ঠাকুরদার টানা হাতের সই, নীচে দুইজন সাক্ষী সই করিয়াছেন—শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ ঘোষ। অর্থাৎ যে তিনজন লোকের হাতে এই উইলের সৃষ্টি, তাঁহারা সকলেই পরলোকে।

যাহার জন্য উইলখানির সৃষ্টি, সে কোথায়, জীবিত না মৃত, কেহ খোঁজ রাখে না।

রক্তমাংসের শরীর লইয়া বাঁচিয়া আছি আমি, যাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য উইলের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমার অতি দুঃখেও হাসি আসিল।

কিন্তু ও উইলের মূল্য কি? কেই বা উহার খবর রাখে? যাঁহারা রাখিতেন, তাঁহারা লোকান্তরে। আজ যদি অসীম ফিরিয়া আসে, তাহাকে তাহার সৌভাগ্যের সংবাদ দিতে পারে শুধু একজন, সে আমি।

যদি সে ফিরিয়া আসে, আর আমি যদি তাহাকে উইলের খবর না দিই? তাহা হইলেই বা কি হয়?

প্রথম কথা, তাহার ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

দ্বিতীয় কথা, এই উইল যাহাতে কোন দিন কাহারও চোখে না পড়িতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা আমার হাতে রহিয়াছে। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া উইলের এক পার্শ্বে ধরিলাম।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে উইল ছাই হইয়া গেল।

ঝড়

কালবৈশাখীর ধূলার হাত এড়াইতে পরেশের বাড়ি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম।

একতলার ছোট ঘরখানায় বসিয়া বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখিতেছি। কালবৈশাখীর এমন মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। জানালার সামনে ধূলি-আচ্ছন্ন আকাশ-বাতাসের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। দূরে মড়মড় করিয়া কি যেন শব্দ হইল। বোধ হয় গাছের ডাল ভাঙিয়া পড়িল। হয়তো বা গোটা একটা গাছই।

এই কয় দিন ধরিয়া অসহ্য গরম পড়িয়াছিল। গাঢ় নীল আকাশের কোনও দিকে মেঘের কোন চিহ্ন ছিল না। আজ সহসা মেঘ দেখা দিল, নীল আকাশে কে যেন নীলকৃষ্ণ কালি লেপিয়া দিল। গরমে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম, একটু বৃষ্টিতে ভিজিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। অবশ্য বৃষ্টিতে ভিজিবার বয়স বহু দিন পার হইয়া আসিয়াছি। কোন্ অতীত যুগে এমন একদিন ছিল, যেদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া আনন্দ পাইতাম, রোগভোগের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তাহার পর অনেক দিন কাটিয়াছে। যাহারা তখনও জন্মায় নাই, তাহারা প্রায় যৌবনে পা দিল। যাহারা ছিল শিশু, তাহারা আজ যুবা। আর আমি যৌবনের শেষ সীমান্ত ছাড়াইয়া আসিয়াছি।

নব-বর্ষণের বিন্দু কয়টির মিষ্টত্ব আস্বাদ করা হইল না। কারণ বৃষ্টিই আসিল না—আসিল ঝড়। বাধ্য হইয়া পরেশের বাড়ি ঢুকিয়া পড়িলাম। আকাশ-বাতাসের রং বদলাইয়া গেল—ধূসর ধূলিতে চারিদিক ঢাকিয়া গেল।

আশ্রয়লাভের প্রথম স্বস্তির ভাবটা কাটিলে পাশের অন্য লোকগুলির খোঁজ লওয়ার অবকাশ ঘটিল। শুধু পরেশ নহে, আরও তিন-চারজন রহিয়াছে, সকলেই বন্ধুস্থানীয়।

আমাদের বয়স চল্লিশের নীচে নহে। প্রায় সারাক্ষণই সে কথা অনুভব করিয়া থাকি। আমাদের কটিদেশের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পরিধি আমাদের বয়সের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। প্রায় সকলেই আমরা মোটামুটি রোজগার ভালই করিয়া থাকি, তাই পলায়নোন্মুখ যৌবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই। বেশভূষা আহারবিহার যতদূর সম্ভব তরুণজনসুলভ করিয়াছি; পঁয়ত্রিশ পার হইয়া হঠাৎ একদিন আয়নায় পূর্ণ দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি, ফলে একটু-আধটু টেনিস খেলাও ধরিয়াছি, বৃথা। যেদিন কৈশোরের পরে যৌবন আসিয়াছিল, সেদিনও প্রায় হঠাৎ তাহাকে চিনিয়াছিলাম, পরে ঠিক তেমনই সহসা বুঝিলাম, যে আসিয়াছিল, সে বিদায় লইয়াছে। বিগত যৌবনের ছায়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আর কোনও লাভ নাই।

এ ঘরের একজন শুধু আমাদের চেয়ে ছেলেমানুষ। সে নিশীথ মিত্র। নিশীথ! এ নাম ত্রিশ পর্য্যন্ত চলে, তাহার পরে কেমন যেন খাপছাড়া শুনায়। এ নাম শুনিলেই মনে হয়, যুবক, কবিত্বে ভরা মন, পৌরুষে ভরা দেহ—এ নাম প্রৌঢ়কে মানায় না।

অবশ্য প্রৌঢ় হইতে নিশীথের এখনও দেরি আছে। তাহার বয়স মোটে পঁয়ত্রিশ; দেহ-মন হইতে যৌবন এখনও নিঃশেষে বিদায় লয় নাই। তাই এখনও তাহার এ নামে চলে। কিন্তু চল্লিশের পরে কি করিয়া চলিবে, ভাবিয়া অকারণে অবাক হই।

নিশীথ মিত্র ঠিক এ দলের নয়। পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশ কখনও একসঙ্গে মিশিতে পারে না। আরও পাঁচ বছর পরে এ ব্যবধান বোধ হয় এতটা

বেশি থাকিবে না। সেদিন প্রৌঢ় আমরা প্রৌঢ় নিশীথকে নিজেদের দলে টানিয়া লইব। কিন্তু আজ সে এ ঘরে আসিয়াছে দায়ে ঠেকিয়া আমারই মত ধূলার হাত এড়াইতে।

বাহিরে ভীষণ বেগে ঝড় চলিয়াছে। আকাশ অদৃশ্য। তাহার পরে সহসা কখন বাতাস পড়িয়া গেল। ধূলি-আবরণ ভেদ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই এ বৎসর প্রথম বর্ষণ। বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া জলের স্রোত বহিয়া চলিল। রাস্তায় একহাঁটু জল জমিয়াছে। জনমানব নাই

রাস্তার দিকে তাকাইয়া কহিলাম, এমন ঝড়বৃষ্টি কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। বন্ধুরা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

শুধু নিশীথ মিত্র বলিল, তা হ'লে হয় আপনারা ভুলে গেছেন, না হয় আপনারা সে বছর বৈশাখে কলকাতায় ছিলেন না। এ ঝড়টাকে যে এত বড় ক'রে দেখছেন, তার কারণ এটা এ বছরের প্রথম ঝড় এবং প্রথম বৃষ্টি। গেল বছরেও প্রথম কালবৈশাখীতে বোধ হয় ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন, নয় কি ?—বলিয়া নিশীথ হাসিল।

নিবারণ কহিল, ঠিক। যে বছরেরই গরমকালে কাগজ উল্টোও, দেখবে, গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন গরম পড়ে নাই। শীতকালে দেখ দেখবে, গত উনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার এমন শীত পড়িয়াছে ওসব মনের ভ্রম।

নিশীথ একটু ভাবিয়া কহিল, তা ঠিক বলতে পারি না, কারণ আমি যে বছরের কথা বলছি, সে বছরেই বোধ হয় আমার জ্ঞানে ভীষণতম ঝড় দেখছি। . শুনবেন সে কথা ?

নিশীথ মিত্র কথা কহিতে জানিত। সিগারেটে খুব জোর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলাম, বেশ তো। চলুক গল্প বৃষ্টিটা কাটবে ভাল। বন্ধুরা সোৎসাহে সম্মতি জানাইলেন।

নিশীথ এক কথায় গল্প আরম্ভ করিতে পারিত না। হাতের আধ-পোড়া সিগারেট ফেলিয়া দিয়া সে একবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইল। ক্যালেণ্ডারের উপরে একটি ফরাসী ললনার ছবি, হয়তো সেদিকে নয়। তাহার পরে পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া অতি ধীরতার সহিত একটি সিগারেট ধরাইল। তাহার পর আবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া গল্প আরম্ভ করিল।

কিন্তু গল্পের প্রথম কয় লাইন শুনিয়াই বুঝিলাম, এ আমার জানা গল্প। অবশ্য নিশীথের কাছ হইতে কোনও দিন শুনি নাই, কিন্তু গল্পের পাত্রপাত্রীদের অধিকাংশকেই আমি বাস্তব জীবনে চিনিতাম। নিশীথ কি বলিতেছে, সেদিকে খেয়াল রহিল না। এক হতভাগ্য পুরুষ আর তাহার দুর্ভাগিনী স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

নিশীথের এক দূরসম্পর্কীয় মাসীর কথা। তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ। বড় জোর বছর চোদ্দ বয়স, আমারই প্রায় সমবয়সী, আমার ঠিক খেলার সাথী ছিল না, কারণ চোদ্দ বছরের মেয়ে মনের বয়সের দিক দিয়া পনরো বছরের কিশোরের চেয়ে অনেক বড়। তবে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এক বাড়িতে তাহারা থাকিত, তাই বেশ পরিচয় ছিল।

মেয়েটির নাম মলিনা। এ নামের আরও দুই-একজন দেখিয়াছি, দেখিয়া কেমন কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, এ নামের মেয়েরা সুখী হয় না। রং তাহার বেশ ময়লা, কালো বলিলে দোষ হয় না। মোটের উপর দেখিতে অত্যন্ত কুরূপা না হইলেও সুন্দরী নয় কিছুতেই। শিক্ষিতা নয়, বাড়ির অবস্থাও বেশ খারাপ। কাজেই সুপাত্রের হাতে পড়িবে, এ দুরাশা কেহ করে নাই। খুব বেশি আশা করিলে মনে হইত, চলনসই দোজবরে পড়িলেও পড়িতে পারে। মেয়ে সুন্দরী না হোক, শিক্ষিতা না হোক, ঘরের কাজ তো জানে।

কিন্তু বিবাহের দিন বরের চেহারা দেখিয়া অনেকেরই চোখ টাটাইয়াছিল, যতক্ষণ না ভিতরের সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। বিবাহের আসরে বরকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কন্দর্পের মত রূপবান বর, অত্যন্ত ফর্সা রং, গরিবের ঘরে রূপহীনা কিশোরীকে ঘরে লইতে এমন রূপকথার রাজপুত্রের আবির্ভাব হইল কি করিয়া? কিন্তু মলিনার চোখে আনন্দের ক্ষীণতম রেখাও দেখি নাই, তাহার মায়ের চোখেও না, তাহার কেরানী বাপের চোখেও না।

কেহ বলিল না, মলিনা আমাদের শিবপূজার ফল পেয়েছে। ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরপক্ষ বধূ লইয়া চলিয়া গেলে মলিনার মায়ের চাপা কান্নার মধ্যে যে বিষাদ অনুভব করিয়াছিলাম, সে শুধু মেয়ের আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় নয়।

মলিনার স্বামীর পরিচয় পাইয়া আমার মত কিশোরের মনেও কেমন একটা নিরানন্দের ভাব আসিয়াছিল। মলিনার স্বামী পাগল। কৈশোরে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়, প্রথম যৌবনে ধনীর ছেলের শরীরের উপর অত্যাচারেরও কোনও ত্রুটি ছিল না, ফলে প্রায় দুই বছর ধরিয়া তিনি পাগল—প্রায় দুরারোগ্য অবস্থা।

আইবুড়ো অবস্থার প্রায় সকল রকম রোগের ধন্বন্তরি বিবাহ। চরিত্রের দোষ ঘটিলে বিবাহ, পড়াশুনায় মন না বসিলে বিবাহ, এমন কি যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলেও বিবাহ। কিন্তু পাগলের পাগলামি সারানোর পক্ষে এমন ঔষধ নাকি নাই।

পনরো বছর বয়সে এসব কি রকম ভাবে গ্রহণ করিয়াছি ভাল করিয়া মনে পড়ে না, কিন্তু তাহার অনেক পরে আরও বহুবার মলিনাকে দেখার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম, আমাকে যদি কেহ কোনও দিন বাংলা দেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা করিয়া দেয়, তাহা হইলে

আমার জীবনের খুব বড় একটা অংশ কাটিয়া যাইবে পাগল ছেলের বিবাহ দেওয়ার মত পাপ যাহারা করে, তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে। জগতের বর্ব্বরতম জাতির নিষ্ঠুরতম শাস্তিবিধানে হয়তো এই ধরনের পাপীদের শাস্তি মিলিতে পারে ; আর কোথাও না। চোখের উপরে একটি নিরপরাধা মেয়ের জীবন দিন দিন ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছি, তাহার মায়ের চোখে উচ্ছ্বসিত জলরাশি দেখিয়াছি—শুধু তাহার বাপের অপরাধ আমি কোনও দিন মার্জ্জনা করিতে পারি নাই, তাঁহার অশ্রুসত্ত্বেও না। বনিয়াদী ঘরের রূপবান ছেলের হাতে রূপহীনা মেয়ের জীবনটা সঁপিয়া দেওয়ার সুবর্ণসুযোগ তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। মানি, এ সুযোগ ছাড়া গরিবের পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাঁহাকে নিষেধ করার লোকের তো অভাব ছিল না। আমার মনে আছে, আমার ছোট-কাকা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এ বিবাহ বন্ধ করিতে। মলিনার বাবা চটিয়া কহিয়াছিলেন, আরে মশায়, মনতোষ আমাদের পাগল কোন্ জায়গাটায়? বলে, কত বিপজ্জনক পাগল, শিকলে বাঁধা পাগল বিয়ে ক'রে সুস্থ হয়ে ঘর-সংসার করছে, আর এই সামান্য মাথাগরম, প্রায় সুস্থ লোকটি চিরকাল পাগল থাকবে? দাঁড়ান মশায়, বিয়েটা হয়ে যাক, দুদিনে দেখবেন, কোথায় পাগল, কোথায় কি! ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

ইহার পরেও তিনি যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাহা আর যেই মানিয়া লউক, আমি পারি নাই।

আরও একজন পারে নাই। সে মলিনার মা। মেয়ের বিবাহের বছরখানেকের মধ্যেই তিনি মারা যান—আমার মতে জন্মান্তরে অর্জ্জিত পুণ্যবলে।

কিন্তু বরের বাপ যদি ভাবিয়া থাকেন যে, যে কোনও রকমের বধূ

ঘরে আসিলেই মনতোষের পাগলামি সারিবে, তবে তিনি নেহাৎই ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার উচিত ছিল সুন্দরী মেয়ে খুঁজিয়া আনা; খুঁজিলে তিনি পাইতেনই। কিন্তু কুরূপা স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া মনতোষের খারাপ মাথা মোটেই ভালর দিকে গেল না, যাওয়া সম্ভবও নয়। পাগলামি দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। মলিনাকে তাহার বাপের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। বয়স তাহার বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু রূপহীন দেহে যৌবনের প্রাবল্যেও রূপের আবির্ভাব হইল না। বরং পাগল স্বামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী শাশুড়ীর শুভেচ্ছার কল্যাণে তাহার হাতে মুখে যে সব দাগ দেখিতাম, এবং বসনের অন্তরালে যে দাগ নিঃসন্দেহ আরও অনেক ছিল, তাহা রূপের দিক দিয়া অনুকূল নহে।

শীতের দিকে মনতোষের মাথা একটু ঠাণ্ডা থাকিত, প্রহারের মাত্রাও কমিত। কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, গ্রীষ্মের আরম্ভে মনতোষ বদ্ধ পাগলে পরিণত হইত। সে সময়ে সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন হইয়া পড়িত—মনতোষের জন্য নয়, মলিনার জন্য।

শাশুড়ী হয়তো ভাবিতেন, ছেলের পাগলামি না সারার জন্য যোল আনা দায়ী তাঁহার রূপহীনা পুত্রবধূ। তাই তাঁহার ব্যবহার শাশুড়ীজনোচিত হয়তো ছিল, কিন্তু মনুষ্যজনোচিত ছিল না।

পাগল স্বামী ও কুরূপা স্ত্রীরও ছেলেমেয়ে হয়। মলিনার যখন উনিশ বছর বয়স, তখন সে দুইটি ছেলেমেয়ের মা। বাপের রূপ তাহারা পাইয়াছিল। কিন্তু মলিনার মনে আনন্দ ছিল না—তাহারা যে বাপের পাগলামি পাইবে না, তাহার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তবু তাহার যন্ত্রণাভরা জীবনের মধ্যে ছেলেমেয়ে দুইটি অনেকখানি সান্ত্বনার স্থল ছিল। শাশুড়ীর নির্যাতনও তাহাদের জন্মের পর একটু কমিয়াছিল।

এই অনবচ্ছিন্ন প্রহার ও অশ্রুর পালার মধ্যে বিরাম ছিল। গর

যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন পাগল মধ্যে মধ্যে বাড়ির বাহির হইয়া পড়িত। দুই মাস, তিন মাস নানা দেশে নানা ভাবে ঘুরিয়া কঙ্কালসার দেহে একদিন আপনিই বাড়ি ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এই কয় দিন সারা শহর তোলপাড় করিয়া ফেলিলেও তাহাকে পাওয়া যাইত না, তাহার প্রধান কারণ সে কলিকাতায় থাকিতই না। এখানে থাকিলে যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিত। পাগলামির ভিতরেও এ সহজ জ্ঞানটুকু তাহার থাকিত।

এই অজ্ঞাতবাসের আরম্ভ হইত এক অদ্ভুত নাটকীয় উপায়ে। যাওয়ার আগে সে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইত যে, সে আর ফিরিয়া আসিবে না; মলিনার যন্ত্রণা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এখন সে দেশে দেশে নানা তীর্থে ঘুরিয়া শরীর ও মন চাঙ্গা করিয়া তুলিতে চায়।

কিন্তু ফিরিয়া সে আসিত।

আমি জানি না, এ রকম ভয়-দেখানো মলিনা প্রথম বারে কি ভাবে লইয়াছিল। কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারি না যে, মলিনা আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল বিচ্ছেদাশঙ্কায়, আমার মনে হয়, সে গোপনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে ডাকিয়াছিল, হে ঠাকুর, এই যেন সত্য হয়।

আমি জানি না, প্রথম বার মনতোষ ফিরিয়া আসিলে মলিনা কি ভাবে সেই পুনর্মিলনকে গ্রহণ করিয়াছিল, হয়তো সে আবার ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমি তো ইহা চাই নাই, আমাকে স্বস্তি-শান্তির আশা দিয়া কেন এমন করিয়া আবার সব ফিরাইয়া লইলে?

কিংবা, কি জানি, হয়তো সে আর ভগবানকে ডাকে নাই, হয়তো চিরদিনের জন্য ভগবানের কাছে আর হাতজোড় করে নাই।

শেষ পর্য্যন্ত মনতোষের এই স্বেচ্ছানির্ব্বাসন সকলেই অত্যন্ত



সহজভাবে লইতে আরম্ভ করিল, বৈশাখ মাসের গোড়ায় কি চৈত্রের শেষাশেষি সে বাহির হইয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে বর্ষণশীতল আষাঢ়ের কোন একটি দিনে। মলিনার এ লইয়া আর কোনরূপ অশান্তি বা উদ্বেগের কারণ রহিল না, আশারও না। শুধু যে কয় দিন সে বাহিরে থাকিত, সেই কয় দিন ছিল মলিনার ছুটির দিন, তাহার দেহ-মনের নিষ্কৃতি। কি জানি, হয়তো প্রতিবারেই একটু ক্ষীণ আশা মলিনার মনে জাগিয়া রহিত, আর মনতোষ ফিরিবে না। কিন্তু সে ফিরিতই তাহার অস্থিচর্ম্মসার দেহ লইয়া। তখন আবার সুরু হইত স্বামীর পরিচর্য্যা, একটা অর্দ্ধমৃত কঙ্কালকে মানুষ করিয়া তোলা।

ইহার ভিতরেও মনতোষের মৌলিকতার অভাব ছিল না। সারা বছর সে মলিনার সহিত যেমন খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন, অজ্ঞাত-বাস হইতে ফিরিয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত সে মলিনার সহিত আশ্চর্য্য ভাল ব্যবহার করিত—ঠিক সাধারণ মানুষের মত নয়, কারণ সাধারণ মানুষ স্ত্রীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করে বলিয়া আমার জানা নাই। সে ব্যবহার যেন একটু অন্য ধরনের পাগলের মত। এই কয় দিন সে মলিনাকে তাহার অপরূপ পাগলামির আদরে স্নেহে অস্থির করিয়া তুলিত।

এই কয় দিনই ছিল মলিনার জীবনে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচার, প্রহার, অপমান তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর তেমন তাপ ছিল না। মনতোষের প্রথম নিরুদ্দেশের প[...] প্রত্যাবর্ত্তনে যে আদরের-দিন কয়টির আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সময় হয়তো মলিনা ভাবিয়াছিল, তাহার দুঃখের নিশা শেষ হইয়াছে। নিকষকালো অসীম রাত্রির মধ্যে তাহা যে শুধু বিদ্যুতের লীলা—বুঝিয়া তাহার কেম[ন] লাগিয়াছিল, কোন দিন ভাবিয়া দেখি নাই, চেষ্টাও করি নাই। মানুষে

হৃদয় লইয়া ভগবানের হৃদয়হীন ক্রীড়ার এ শুধু একটা উদাহরণ বই তো আর কিছুই নয়।

দিন পনরোর মধ্যেই স্নেহ ও আদরের দিন শেষ হইত, আবার আরম্ভ হইত প্রহার, নির্যাতন, চিরদিনের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি।

তাহার পর এক বৈশাখের অসহ্য গরমে মনতোষ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কাহারও এতটুকু ব্যস্ত হওয়ার কারণ ঘটিল না।

তার পর এক মাস দুই মাস করিয়া অনেক দিনই কাটিয়া গেল, কোন বৃষ্টিসজল আষাঢ়েই আর মনতোষ ফিরিল না।

কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার বারো বৎসরের মধ্যে নাকি স্ত্রী বিধবা হয় না, মলিনাও সধবা রহিয়া গেল।

মলিনার ছেলে মেয়ে দুইটি বড় হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, এখনও তাহাদের মাথাখারাপের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আর কখনও না পাইতেও পারে।

যে যাহাই বলুক, আমার মতে মলিনা সেই বৈশাখ হইতে সুখের সন্ধান পাইয়াছে।

কতক্ষণ ধরিয়া এসব ভাবিতেছিলাম, কিছু খেয়াল ছিল না; ঘরের মধ্যে নিশীথের গল্পের একটি কথাও আমার কানে যায় নাই। যাওয়ার দরকারও ছিল না। কারণ সে কি বলিয়াছে আমি জানি।

সহসা নিশীথের গল্প থামিল, আমারও চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। একটু অপ্রস্তুতভাবে আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম।

নিশীথ গল্প শেষ করিয়া পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল।



খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিল। তাহার পর নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, তারপরে আর তাকে পাওয়া যায় নি ?

না।

আচ্ছা, সেদিন থেকে বারো বছর পর্য্যন্ত আপনার মাসী তো সধবা ?

নিশ্চয়ই।

বাহিরে রাত্রি হইয়াছে। কালো আকাশে একটিও তারা নাই। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। মনে হইল, সকলেই অন্তত কিছু-ক্ষণের জন্য এই দুর্ভাগিনী নারীর কথা না ভাবিয়া পারিবে না।

অন্তত আমি পারিলাম না। মলিনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। কলিকাতার এক জনবহুল পল্লীর একটি গলির মধ্যে একটি বাড়ি। দৈন্য চারিদিকে পরিস্ফুট। তবু একটি রাত্রিতে তাহাকে সাজাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। গুটি-কয়েক গ্যাসের আলোতে দৈন্য-দুর্দ্দশা আরও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেওয়ালের চারিধারে ফাটল। বাড়ির লোকগুলিও বাড়ির মতনই নিরানন্দ।

তাহারই একটি ঘরে রোদনরতা কিশোরী।

তাহার পরে লোকজন লইয়া আলোয় চারিদিক ভরিয়া বাজনা বাজাইয়া কাহারা আসিয়া গলির বাহিরে বড় রাস্তায় থামিল।

কন্দর্পের মত রূপবান এক তরুণ।

এমনই আরও অনেক কথা মনে পড়ে। তাহার সহিত আরও একটা কথা মনে পড়ে, তাহা নিজের কৈশোর।

মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

বৃষ্টি ধরিয়া আসিতেছে। রাস্তার আলোর সামনে বৃষ্টির রেখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ভিজা মাটির গন্ধে মন আকুল হইয়া উঠিল।

বিগতযৌবন দেহে বিগতযৌবন মন লইয়া কোন্ বহুদূরবর্ত্তী দিবসের স্মৃতির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

একটা ট্রাম রাস্তার মধ্যে ঘাসে-ঢাকা লাইন দিয়া বিশ্রী কর্কশ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, আমার অবান্তর অর্থহীন স্বপ্নকে চূর্ণ করিয়া। শুনিলাম, মনোরঞ্জন নিশীথকে বলিতেছে, কিন্তু এর সঙ্গে তো ঝড়বৃষ্টির খুব বেশি সম্বন্ধ টের পাওয়া গেল না! আপনি তো ঝড় নিয়েই গল্প স্থরু করেছিলেন!

স্থরু করেছিলাম, শেষ তো এখনও করি নি।

আরও আছে নাকি?

আছে বইকি। বাকিটা এইবার শুনুন।

মেসোমশায় নিরুদ্দেশ হওয়ার বছরখানেক পরে আমি ট্রামে যাচ্ছিলাম এস্প্ল্যানেডের দিকে। পথে এল ঝড়। ধূলোয় চারিদিক ভ'রে গেল। আমাদের প্রায় অন্ধ ক'রে দিয়ে তারপরে বৃষ্টি নামল। সে বৈশাখে সেই প্রথম ঝড়, প্রথম বৃষ্টি। ট্রামে থাকতে পারলাম না, নেমে পড়লাম।

ময়দানের ধারে একটা গাছের ডাল ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। কাছে এগিয়ে দেখি, তলায় একটা মানুষের দেহ। জনকয়েক লোক ডাল সরিয়ে যখন লোকটাকে বার করলে, ততক্ষণে তার হয়ে গেছে। একটা কঙ্কালসার দেহ, দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন মুখ, পরনে শতছিন্ন ন্যাকড়া। কিন্তু আমি তাকে দেখেই চিনেছিলাম, সে আমার নিরুদ্দিষ্ট মেসো-মশায়।

ঠিক এটা কেহই প্রত্যাশা করি নাই, খানিকক্ষণ কেহই কথা কহিতে পারিলাম না। তাহার পরে পরেশ কহিল, তার মানে আপনি এতদিন তাঁর মৃত্যু লুকিয়ে রেখে আপনার মাসীকে সধবা সাজিয়ে রেখেছেন?

ঠিক। আমাদের দেশে সধবা আর বিধবার জীবনযাত্রার আকাশ-পাতাল তফাত। এগারো বছর ঐ রকম একটা জীবের সঙ্গে ঘর ক'রে তারপরে বৈধব্য একটা মুক্তি হ'ত সন্দেহ নেই, কিন্তু হিন্দুসমাজে সধবার অবস্থা যেমনই হোক না কেন, বিধবার চেয়ে কোটিগুণে ভাল।

মনোরঞ্জন বলিল, কিন্তু আপনি যখন সৎকারের বন্দোবস্ত করলেন, তখন জানাজানি হয় নি?

হয়তো হ'ত, যদি আমি সে বন্দোবস্ত করতাম। কিন্তু পাছে এমনি একটা গোলযোগ বাধে, সেই ভয়ে সে বন্দোবস্ত আমি করি নি; সেসব কর্পোরেশনের ডোমে করেছে।

পরেশ এইবার যথার্থই চটিয়া কহিল, আপনার একজন আত্মীয়ের দেহ আপনি অসঙ্কোচে ডোমের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলেন, একটুও বাধল না?

উপায় কি? মৃত্যুর দাবির চেয়ে আমার কাছে জীবনের দাবির মূল্য অনেক বেশি। সেইজন্যেই এ রকম তথাকথিত অন্যায় করতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করি নি, দরকার হ'লে ভবিষ্যতেও করব না।

শুধু আমি নিশীথের উপর চটিতে পারিলাম না। মনে হইল, সে আর যাহাই করিয়া থাক, মনোতোষের মৃত্যুর দিন হইতে এগারো বছরের জন্য মলিনাকে বৈধব্যের কৃচ্ছ্র হইতে বাঁচাইয়াছে। ন্যায়-অন্যায় এসব দিক দিয়া বিচার করিতে আমি কোন দিনই পারি না, আজও পারিলাম না। কিন্তু আজ সহসা নিশীথ এত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল কেন?

এই কথাটিই বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল একটু রূঢ়ভাবে। কহিল, আপনার ফিলসফিকে ধন্যবাদ। কিন্তু এতদিন লুকিয়ে রেখে আজ হঠাৎ এত বড় গোপন কথাটা প্রকাশ ক'রে ফেললেন, তার কারণ?

নিশীথ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া একবার হাসিল। পরে কহিল, তার কারণ আজ ঠিক বারো বছর আগে মেসোমশাই শেষবারের মত নিরুদ্দেশ হন ; সকালবেলা দেখে এসেছি, মাসীকে শাড়ি ছাড়িয়ে থান পরানো হয়েছে।

বলিয়া নিশীথ আর একবার হাসিল।

অভিনেতা

সন্ধ্যার অন্ধকারে পুকুরপাড়ে একাকী বসিয়া সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করিতেছিলাম ও আকাশপাতাল ভাবিতেছিলাম। দেবীপক্ষ শেষ হইয়া গিয়াছে। কালীপূজার কয়েক দিন আগে। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু তারার আলোয় ধরণীকে অস্পষ্ট আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, মসীকৃষ্ণ হইতে দেয় নাই।

আমার চিন্তার কারণ খুব বেশি গুরুতর নহে। কালীপূজার সময় গ্রামের ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক মহাসমারোহে দুইখানি যুগান্তকারী নাটকের অভিনয়। নাটক দুইখানি হয়তো যুগান্তকারী হইতে পারে, অথবা না হইতেও পারে, কিন্তু অভিনয় যাহা হইবে, তাহাকে ঠিক যুগান্তকারী, এমন কি দিনান্তকারীও বলা যাইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহার কারণ অবশ্য ইহা নহে যে, আমাদের গ্রামের শখের থিয়েটারের দল অত্যন্ত আনাড়ী এবং অভিনয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমাদের গ্রামে বিশেষ করিয়া আমাদের বাড়িতেই, জনকয়েক বেশ ভাল অভিনেতা আছেন, এবং আমিও নাকি তাঁহাদের মধ্যে স্থান পাইতে পারি; অবশ্য নিজের মুখে এ কথা না বলিলেই হয়তো শোভন হইত।

কিন্তু আসল বিপদ এই যে, আমাদের গ্রাম দীর্ঘকায় লোকের গ্রাম। এখানকার শখের থিয়েটারে নায়কের ভূমিকায় সুপুরুষ অভিনেতা মিলে, গুণ্ডার ভূমিকার জন্য ভীষণদর্শন লোকেরও অভাব নাই। যাহা মিলে না, তাহা স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করার লোক। আমি নিজে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মানুষ হইয়া পাঁচ ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চি নায়িকার সহিত প্রেম করিলে অভিনয় কি প্রকার জমিবে, সে বিষয়ে একটু আশঙ্কান্বিত হইয়া

উঠিয়াছিলাম, এবং বিশেষ করিয়া এই কথাটাই এই স্তব্ধ সন্ধ্যায় নির্জ্জন আকাশতলে আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এমন কঠিন চিন্তাও আমার মনকে বেশিক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। কারণ শহরের লোক আমি, বৎসরান্তে একবার বড়জোর গ্রামে আসি, পুকুরপাড়ে গভীর কালো জলের পাশে বসিয়া দূরের অসংখ্য খেজুর ও নারিকেল গাছ, বিস্তীর্ণ বাঁশঝাড়, হেমন্ত-সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা, দূর আকাশের তারা, পুকুরের ওপারে যে মেয়েটি ছায়ার মত মাটির কলসীতে জল ভরিতেছে, সেই ছলছল শব্দ সমস্ত মিলিত হইয়া যে মায়া রচনা করিতেছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার শক্তি আমার খুব বেশি ছিল না। শুধু ভয় হইতেছিল, এখনই কে আসিয়া পড়িবে, আমার পল্লীস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া যাইবে।

নিজের গ্রামকে এ দৃষ্টিতে আগে কখনও দেখি নাই। আমার মনে হইল, এই বিস্তীর্ণ বাড়ি, এই পুকুর, বাগান, দূরের অদৃশ্য ধানক্ষেত, সমস্ত জিনিসে আমার অংশ রহিয়াছে, আমি এই পশ্চিমের বাড়িরই সন্তান। জলের উপর আবছা অন্ধকারে যে সাদা রঙের নালফুল ফুটিয়া পুকুরের অবিচ্ছিন্ন কালোকে স্বল্প শুভ্রতা দিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি পাপড়ি—অতি সূক্ষ্ম রেণুটুকুতে পর্য্যন্ত আমি অধিকারী, এ সকলের সহিত, এই বাড়ির সম্পর্কিত দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুর সঙ্গে, আমার অতীত, আমার বর্ত্তমান, আমার অনাগত ভবিষ্যৎ, সমস্ত ওতপ্রোত। ইচ্ছা করিয়া দূরে সরিয়া গেলেও ইহারা আমাকে ছাড়িবে না, অথবা ইহাদের উপর আমার অধিকার একবিন্দুও কমিবে না। আমার জীবনের উষাকালে আমি ইহাদের সহিত পরিচিত হই নাই, বাংলা দেশের বাহিরে সাঁওতাল পরগণার এক শহরে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখিয়াছিলাম। আমার জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান আমি নগরের মায়ায় কাটাইতেছি, দুঃখিনী

পল্লীর সহিত ক্ষণিকের পরিচয় করিয়া আবার তাহাকে ভুলিয়া নগরের প্রখর আলোকে দিক্‌ভ্রান্ত পতঙ্গের মত যৌবনের সকল উদ্যম, সকল শক্তি ডালি দিতেছি। আবার হয়তো জীবনের গোধূলিতে, যখন পল্লী নগর সারা পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া বিদায় লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইব, তখনও হয়তো খুলনা জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামটির পশ্চিম কোণের এই লাল রঙের বাড়ি, এই চণ্ডীমণ্ডপ, ঠাকুরঘর, বাহিরে স্থলপদ্ম ও শেফালি ফুলে ভরা এই বৃহৎ বাগান, এই ভাঙা পুকুরপাড়, কালো জলের উপর কলমিশাক, নালফুল—ইহাদের কেহ আমার জাগ্রৎ মনের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও অধিকার করিয়া থাকিবে না। আমার পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাকে নিতান্ত স্বল্পপরিচিত, ক্ষণিকের খেলাঘরের সাথী বলিয়া মনে করিয়াছি, আজ মনে হইল, সে আমার জীবনের, আমার মৃত্যুর, আমার নিদ্রা এবং জাগরণের প্রধানতম বন্ধু, আমার নিতান্ত আপনার জন, আমি পথভ্রান্ত প্রবাসী। জানি, এ গ্রাম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বছরের মত গ্রামের স্মৃতি আমার মন হইতে বিদায় লইবে, যেমন করিয়া আমার পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত লইয়াছে। কিন্তু ইহার আগে কি কখনও নিঃসঙ্গ পুকুরপাড়ে ভাঙা সিঁড়ির উপর কৃষ্ণানবমীর দিন বসিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়াছি? হয়তো না।

নায়েব মহাশয়ের ঘর হইতে তারস্বরে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বুঝিলাম, রিহার্সালের সময় হইয়াছে; এবং এখনই নিজের অপেক্ষা দেড় ইঞ্চি দীর্ঘতর এক ব্যক্তিকে নায়িকা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত গভীর ও কাব্যভাবপূর্ণ প্রেমের অভিনয় করিতে হইবে।

মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, রিহার্সাল তো রোজই রহিয়াছে, আজিকার মত স্বপ্নমায়াপূর্ণ সন্ধ্যা আর তুমি কবে পাইবে? যাহারা ডাকিতেছে, তাহারা ডাকুক, কিন্তু তোমায়

আজ একা থাকিতে হইবে, শুধু আজিকার সন্ধ্যা ; দূরে চলিয়া যাও, যেখান হইতে কাহারও চীৎকার তোমার কানে ঢুকিবে না।

মন যাহা বলিল, সম্পূর্ণ বিচার-বিবেচনারহিত হইয়া তাহাই করিয়া বসিলাম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিলে বুঝিতে পারিতাম, যাহা করিতেছি তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও চরম বুদ্ধিহীনতা।

একাকী সেই অন্ধকার সন্ধ্যায় গাঢ় বনভূমির ভিতরের সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম খেয়াল ছিল না, সহসা মনে হইল, আধ ঘণ্টা আন্দাজ হাঁটিয়াছি। এতক্ষণ চলিলে কতকগুলি পরিচিত বাড়ি চোখে পড়া উচিত, তাহারা যথাস্থলে রহিয়াছে কি না দেখার জন্য পকেট হইতে ছোট টর্চটি বাহির করিলাম, এবং সভয়ে দেখিলাম, পথ ভুল করিয়াছি। যে পথ দিয়া আসিয়াছি, সেখান হইতে দিনের বেলায় চেষ্টা করিলে হয়তো বাড়ি ফিরিতে পারিতাম, কিন্তু পল্লীর সহিত আমার যে স্বল্প পরিচয়, তাহা লইয়া এখান হইতে ঠিক পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাড়ি ফেরা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সেই ক্ষুদ্র টর্চটিকে সম্বল করিয়া ফিরিলাম, এবং আবার প্রায় আধ ঘণ্টা চলিবার পরও যখন পরিচিত কিছু চোখে পড়িল না, তখন বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি।

শহরের লোক আমি, এত দিন রাত্রির নিজস্ব মূল্য তাহাকে দিই নাই। নগরী রাত্রিতে বিলাসিনীর মত আলোকমালায় দেহ সাজাইয়া সেই আবরণে নিজের রূপের দৈন্য লুকাইয়া রাখে। এইটুকু শুধু সেখানে দিবা ও রাত্রির প্রভেদ। কিন্তু রাত্রি নয়টার সময়ে রাস্তার উপরে সেখানে আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি না, সে উৎকণ্ঠা সঞ্চার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কিন্তু এই বনানীবেষ্টিত পল্লীর আছে।

ভীতু ছেলে যাহাদের বলে, আমি সে রকম নই। কিন্তু যেটুকু

দৈহিক ও মানসিক সাহস এত দিন পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, দেখিলাম, সমস্ত সম্বল করিয়াও আমি একান্তভাবে নিঃসহায়।

অনেকক্ষণ জ্বলিয়া আলোর শেষরশ্মিটুকুও নিবিয়া গেল। এই বিরাট অন্ধকারে, গভীর বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে হইল, এ শুধু অকৃতজ্ঞ পুত্রের উপর পল্লীমাতার প্রতিশোধ। এত দিন ধরিয়া যাহার স্নেহ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তাহার কঠোর তিরস্কার অন্তত খুব উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে না, তাহা সে জানে।

অত্যন্ত মৃদু বাতাস বহিতেছিল, ঘন পাতার আবরণের ভিতর দিয়া বাতাস আসিয়া যে অনৈসর্গিক সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা খুব ভাল লাগিল না। কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। কিন্তু বুঝিলাম, দাঁড়াইয়া থাকিলে সে ভয়ের কোন কিনারা হইবে না, এবং সকলের বড় যে ভয়, অর্থাৎ সাপের ভয়, তাহা কমিবে না। তাহার চেয়ে লক্ষ্যহীনভাবে চলা ভাল। আবার পথ ধরিলাম।

পল্লীর পথে, বিশেষ করিয়া বনপথে, সন্ধ্যার পর লোক-চলাচল থাকে না। তাই ইহার পরে আরও প্রায় এক ঘণ্টা ঘুরিয়াও এমন একটি লোকের দেখা পাইলাম না, যাহার কাছে বাড়ির পথের খবরটা একটু জানিয়া লইব।

নিজেরই মনে হইল, কি লজ্জার কথা! নিজের বাড়ি হইতে সামান্য একটু দূরে আসিয়া তুমি নিজের বাড়ির পথ হারাইয়া ফেল, এই তো তোমার পল্লীজননীর সঙ্গে সম্বন্ধ! আজ যদি সে পঁচিশ বৎসরের অবহেলার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়া থাকে, তোমার তাহাতে কি বলিবার আছে? কিছুই নাই।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। হয়তো খানিক পরে চাঁদ উঠিবে, কিন্তু এই ঘনসন্নিবিষ্ট অগণিত গাছের আড়াল দিয়া যে আলোটুকু আসিবে, তাহাতে যখন পথ দেখার কোন স্থবিধা হইবে না, তখন চাঁদ উঠিলেই বা কি, আর না উঠিলেই বা কি? তবু হাঁটিয়া চলিলাম, জানিতাম, একবার দাঁড়াইলে আর হাঁটার শক্তি খুঁজিয়া পাইব না, পা দুইটিকে একটু বিশ্রাম দিলে তাহারা একেবারে জবাব দিবে। ক্লান্তির অবধি ছিল না, তবু সমস্ত ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া নানা অজ্ঞাত জিনিসের উপর সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আগাইয়া চলিলাম।

কি অদ্ভুত এই বনের নিস্তব্ধতা! স্তব্ধতা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, ভাবিলাম, একটু বেস্থরো গলায় চীৎকার করিয়া গান গাহিয়া একটু পরিচিত শব্দ শুনি। কিন্তু একবার মুখ খুলিতেই নিজের গলার স্বরে এতটা চমকাইয়া উঠিলাম যে, মনে হইল, স্তব্ধতাই ভাল, আমার আওয়াজে কাজ নাই। যদি একটা লোকেরও দেখা পাইতাম, তাহাকে কিছু বকশিশ দিয়া বাড়ি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিতাম! অন্তত বাড়ির পথটার সম্বন্ধে একটু সচেতন হইতে পারিতাম! হয়তো আমি বাড়ি হইতে বেশি দূরে নাই, শুধু বনের গোলকধাঁধার মধ্যে অবিরত ঘুরিয়া মরিতেছি।

এত বিপদের মধ্যেও শুধু দুটি কথা আমার মনে সবচেয়ে বেশি করিয়া জাগিতেছিল। বাড়ির সকলে, বিশেষ করিয়া মা এবং অন্যান্য মেয়েরা কি পরিমাণ চিন্তিত হইয়াছেন—এই হইল সবচেয়ে বড় চিন্তার কথা, এবং দ্বিতীয়, যদি কোনও উপায়ে বাড়ি ফিরিতে পারি, তবে পুরুষদের কাছে শহুরে ভূত নামে সম্বর্দ্ধিত হইয়া কি প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিব! একেই তো যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও খাঁটি খুলনার ভাষা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে মুখ দিয়া বাহির করিতে পারি না বলিয়া বেশ একটু ঠাট্টা সহ্য করিতে হয়; তাহার উপর আবার এই।

হঠাৎ মনে হইল, জঙ্গল পাতলা হইয়া আসিয়াছে, এবং কয়েক পা আগাইয়া দেখিলাম, জঙ্গল ছাড়িয়া খোলা মেঠো রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। মনে ভরসা হইল। যদি কোন লৌকিক অথবা অলৌকিক উপায়ে লোকালয় চোখে পড়ে, তবে বাড়ি ফিরিবার আর বিশেষ কোনও অসুবিধা হইবে না। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ কপালে আছে, কিন্তু তাহা লইয়া ভাবিয়া মরিলে লাঞ্ছনার মাত্রা কমিবে না।

রাত্রি বোধ হয় বারোটা। যখন পা আর চলে না, ঠিক সেই সময়ে দূরে গাছপালার আড়াল দিয়া লোকালয়ের আলো চোখে পড়িল। বুঝিলাম, এতক্ষণে মানুষের বাড়ির কাছে আসিয়াছি। বাড়িতে যেই থাক এবং যে অবস্থাতেই থাক, আমার এই জঙ্গল-জীবন ছাড়িয়া সভ্য জগতের আলো দেখিতেই হইবে, তাহা যত দূর অভদ্রতাই হোক না কেন।

কাছে আসিয়া দেখিলাম—পাকা বাড়ি, সেই মধ্যরাত্রির অন্ধকারেই বুঝিলাম, অত্যন্ত পুরাতন এবং জীর্ণ। দেওয়ালে বালির আবরণ নাই, ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে।, বাড়ির বাহিরে খানিকটা জমি লইয়া বাঁশের বেড়া।

এত রাত্রে লোকের বাড়ি গিয়া ঢোকা অন্যায় এবং অভদ্রতা সন্দেহ নাই, কিন্তু যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহার অভিধানে অন্যায় এবং অভদ্রতা বলিয়া কোন কথার অস্তিত্ব নাই। একটু ইতস্তত করিয়া দরজায় ধাক্কা দিলাম, এবং প্রায় একই সঙ্গে দরজা খুলিয়া লণ্ঠন-হাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দেখা দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, কে, এত রাত্রে— ? বলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, কে, সুনীল না ?

আমি যে সুনীল নহি, এ কথা বলিবার আগেই আলো আরও বেশি করিয়া আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল, এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

ভদ্রলোক কহিলেন, না, আমারই ভুল হয়েছে, কিছু মনে ক'র না বাবা। কিন্তু এত রাত্রে— ?

বুঝাইয়া বলিলাম। অত্যন্ত লজ্জার সহিত স্বীকার করিলাম, নিজের গ্রামে আসিয়া পথ হারাইয়া সন্ধ্যা হইতে বন-জঙ্গল দিয়া ঘুরিতেছি। এখন তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে একটি লোক দিতে পারেন, অন্তত গ্রামের পথটা যদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন—

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, আপনার বাড়ি কোন্ গ্রামে ?

জলগাঁ।

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, জলগাঁ ? সে তো এখান থেকে ছ-সাত মাইলের ওপর ! আপনি তো কম পথ হাঁটেন নি !

স্বীকার করিতে হইল, অনেকখানি পথই হাঁটিয়াছি, এবং বনের ভিতর লক্ষ্যহীনভাবে না ঘুরিয়া সোজা পথে হাঁটিলে চোদ্দ পনরো মাইল হাঁটা হইত।

তিনি হাসিলেন। বলিলেন, সে যাই হোক, আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে আর লোক কোথা থেকে দোব, কাল সকালে বরং যাবেন। আজকের রাতটা কোনও রকমে এখানেই কাটিয়ে যান।

বলিলাম, আপনার অনেক অসুবিধে হবে। তা ছাড়া বাড়ির সবাই কি পরিমাণ ভাবছেন, সে কথা ভেবে আমারই ভাবনা হচ্ছে। পথটা যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন—

তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন, বুঝিয়ে দিলেই যে আপনি ঠিকভাবে যেতে পারবেন, তা কে বললে ? এ তো কলকাতার রাস্তা নয়। আবার পথ হারিয়ে গেলে কি আপনার আত্মীয়দের ভাবনা কমবে ? আমার অসুবিধে হবে না, আপনি আজকের রাতটা থেকে যান।

যুক্তি মানিতে হইল। কহিলাম, উপায়ই যখন নেই, তখন আপনার

অসুবিধে ক'রেও থাকতে হবে। আমার জন্যে ভাববেন না, এই বারান্দার তক্তাপোষে—

তিনি শশব্যস্তে কহিলেন, সে কি কথা, আপনি এখানে থাকবেন কেন? বাইরের ঘরের খাটে ফরাশ পাতা আছে, আজ কষ্ট ক'রে সেই-খানেই রাতটা কাটান। আপনি অতিথি, আপনাকে যত্ন করতে পারছি না, তার ওপর আবার বাইরে তক্তাপোষে—? ক্ষেপেছেন? আপনি আসুন ভেতরে।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া তিনি একটা চৌকির উপর আলো রাখিয়া বলিলেন, আপনি বসুন, আমি আসছি এখুনি।

ঘরটির চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। এমন দৈন্যদশাপূর্ণ ঘর জীবনে খুব বেশি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। দেওয়ালের চুন বালি খসিয়া পড়িয়াছে, এবং ছাদের উপর হইতে আরম্ভ করিয়া মেঝে পর্য্যন্ত ঝুল নামিয়া ঘরখানিকে অত্যন্ত কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে। দেওয়ালে বহু পুরাতন ধূলিধূসরিত কয়েকখানি দেবদেবীর ছবি, এবং একটি ছোট ফোটোগ্রাফ।

একটু অসঙ্গত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ফোটোখানি ভাল করিয়া দেখিলাম। একটি নববিবাহিত দম্পতীর চিত্র। মেয়েটি সুন্দরী, বছর ষোল-সতরো বয়স। কিন্তু আমি অবাক হইলাম ছেলেটিকে দেখিয়া। মনে হইল, অনেকটা ইহারই মত চেহারার একটি লোককে আমি খুব ভাল করিয়া চিনি। কিন্তু সে যে কে, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। হাল ছাড়িয়া দিয়া খাটে আসিয়া বসিলাম, এবং সেই মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, কাহার কথা ভাবিতেছি। সে আমি নিজে। এবং এ কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিলাম, ইহারই নাম সুনীল, এবং ভদ্রলোক আমাকে এই লোকটি ভাবিয়াই ভুল করিয়াছিলেন।

অকৃতজ্ঞের মত মনে হইল, ভদ্রলোকের এতখানি সৌজন্য, এবং

সম্পূর্ণ অপরিচিতকে বিনাবাক্যব্যয়ে রাত্রিতে আশ্রয় দেওয়া, এ সকলের মূলে রহিয়াছে, এই স্থনীলের সহিত আমার চেহারার সাদৃশ্য।

এমন সময় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, জলগাঁয়ের কোন্ বাড়ির ছেলে আপনি ?

পশ্চিম বাড়ির।

অনন্তবাবু আপনার কে হন ?

জ্যেঠামশায়।

কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নাম ?

নাম বলিলাম।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এ গ্রামের নাম কি ?

কালীহাট।

খানিকটা আত্মগতভাবেই তিনি বলিলেন, আপনার জ্যেঠামশায় আমাকে চিনতেন। সমস্ত বন্ধুবান্ধব যখন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু তাঁর কাছ থেকেই আমি সহানুভূতি পেয়েছি।

সহসা তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনি নিশ্চয় আমার নাম শোনেন নি, আমার নাম সারদাচরণ বস্থ। চেনেন ?

মনে পড়িল না।

তিনি কহিলেন, আপনার একটু খাবার যোগাড় করতে পারলে হ'ত, কিন্তু—

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, একটুও দরকার নেই, একটুও না। আমার এখন একমাত্র দরকার ঘুম। আর কিছু না।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, তা ছাড়া এদিকের কেউ তো আমার হাতে খায় না, আমি একঘরে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, একঘরে ?

হ্যাঁ।

এইবার তাঁহাকে চিনিলাম। কালীহাটের সারদা বসু। সুন্দরী মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন বড় ঘরে কলিকাতায়। ছেলেটি সুশ্রী এবং সচ্চরিত্র। তাঁহার মেয়ে এবং জামাতার মধ্যে মনের যে মিল হইয়াছিল, এতখানি নাকি সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু বিবাহের দুই তিন বছর পরে মেয়ের নামে কুৎসা রটে, এবং ফলে পিতৃভক্ত জামাই আবার বিবাহ করেন, এবং কলঙ্কিনী মেয়েকে ঘরে স্থান দেওয়ার অপরাধে সারদাবাবু একঘরে। যতদূর শুনিয়াছি, তিনি ও তাঁহার মেয়ে ভিন্ন বাড়িতে আর কেহ নাই, এবং এই প্রৌঢ়ের উপর সংসারের সমস্ত ভার। মেয়েটি ঘটনার পর হইতেই রুগ্না।

সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রকৃতই মেয়েটির কোন অপরাধ ছিল কি না, জানি না ; যদি থাকে, তাহা হইলে সুনীলকেও খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। তবু এইখানে এই বাড়িতেই বসিয়া সমস্ত ঘটনা মনে পড়াতে মনটা বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

বোধ হয় একটু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন, আপনিও নিশ্চয়ই একঘরের বাড়ি খাবেন না ?

সমস্ত মনটা লজ্জায় নীচু হইয়া গেল ; জোর করিয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই খাব। আপনি এখনই দিন।

সেই রাত্রে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বনের ভিতর ঘুরিয়া যে ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহাতে আহারের উপকরণ বিচার করা চলে না। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত বাসি মুড়ি গুড় দিয়া খাইয়া এক ঘটি জল নিঃশেষ করিয়া কহিলাম, আর না, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, যতদূর সম্ভব! আপনি আর কষ্ট করবেন না, শুয়ে পড়ুনগে ; আমিও একটু শুই।

তিনি ম্লান মুখে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ঘুমোবার তো উপায় নেই, মেয়ের অসুখ, তার ঘরেই একবার যাই।

অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিলাম। মেয়ের কঠিন অসুখ, এবং তাহার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক আসিয়া এইরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছি, পাড়াগাঁয়েও সকলে ইহা সহ্য করে না; শহরে তো ইহা রূপকথা।

অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অসুখ? অসুখ কি খুব বেশি?

বেশি নিশ্চয়ই, কিন্তু অসুখটা যে ঠিক কি, সেইটেই তো জানি না। ভুগছে অনেক দিন ধ'রে। ডাক্তার তো নেই যে দেখাব!

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন, এদিকে ডাক্তার নেই?

আছে; কিন্তু একঘরের বাড়ি কেউ চিকিৎসা করতে আসে না।

যে দুর্ব্বুদ্ধি আজ আমাকে সন্ধ্যার সময় ঘরছাড়া করিয়াছে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া বলিলাম, দেখুন, আমি মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট। অবশ্য চিকিৎসার বিশেষ কিছু জানি না। তবু আপনার মেয়েকে একবার দেখতে পারি কি?

প্রৌঢ় যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। সাগ্রহে কহিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার মেয়ের অসুখ হওয়া অবধি একদিন ডাক্তার দেখাতে পারি নি, অথবা ভাল ওষুধ খাওয়াতে পারি নি। আর্থিক অবস্থা যে কি রকম, তা তো বুঝতেই পারছেন।—বলিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন।

আমার কিন্তু চোখে জল আসিল।

মেয়েটিকে দেখিয়া বুঝিলাম, ইহার রোগ নির্ণয় করিতে পাস-করা ডাক্তার, এমন কি মেডিক্যাল স্টুডেণ্টেরও প্রয়োজন হইবে না। ইহার

চোখে, মুখে, সমস্ত দেহে, একটি মাত্র রোগের আগমন-চিহ্ন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা যক্ষ্মা।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, রোগ যে কি, তা হয়তো আমিও জানি, হয়তো যা ভাবছি তাই। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

উভয়ে বাহিরে আসিলাম।

আত্মগতভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, মীরা আমার কি সুন্দরীই ছিল! ভাল বিয়ে দিলাম সতরো বছর বয়সে; তারপরে—

বাধা দিয়া বলিলাম, আমি জানি। কিন্তু আপনার ও কথা ভেবে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই।

অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে তিনি বলিলেন, আপনি জানেন আমার মেয়ের কলঙ্কের কথা?

বিব্রত হইয়া বলিলাম, হয়তো জানি, কিন্তু সে কথার আলোচনা এখন থাক।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, আপনার সঙ্গে আমার জামাই সুনীলের চেহারার খানিকটা মিল আছে, তাই প্রথমটা আপনাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু চেহারার তফাতও আছে। সে আপনার চেয়ে একটু ফরসা, আর অত লম্বা নয়। আচ্ছা, আপনার বয়েস কত হ'ল?

পঁচিশ।

সুনীলের বয়েস এত দিনে হ'ল উনত্রিশ। আর আমার মীরার বয়েস হ'ল তেইশ।

ভাবিলাম, তিনি আবার তাঁহার মেয়ের কলঙ্কের কথা তুলিবেন,

কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না। লণ্ঠনের আলোয় দেখিলাম, তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

পাশের ঘরে অস্ফুট শব্দ শুনিয়া সারদাবাবু বুঝিলেন, মীরার ঘুম ভাঙিয়াছে। তিনি উঠিয়া তাহার কাছে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘুমের ইচ্ছা দমন করিয়া সেই ঘরেই ঢুকিলাম।

মীরার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সে যে এককালে সুন্দরী ছিল, তাহার যক্ষ্মাক্লিষ্ট দেহ দেখিলেও তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমি আর একবার তাকাইয়া দেখিলাম।

এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে তাকাইয়া মীরা চীৎকার করিয়া উঠিল, এসেছ, তুমি ফিরে এসেছ ?

একটুও বিস্মিত হইলাম না। আমি এই জিনিসটারই প্রত্যাশা করিতেছিলাম।

সারদাবাবু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সোজা মীরার কাছে গিয়া তাহার বিছানায় বসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ মীরা, আমি এসেছি, আমি সুনীল।

সারদাবাবুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করিবার মত সময় আমার তখন ছিল না। আমার শুধু একটি কথা মনে হইল। এই মেয়েটি আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিত্যক্তা। নিঃসন্দেহ সে তার স্বামীকে ভালবাসিয়াছিল, পল্লীর অর্দ্ধশিক্ষিতা গরিবের ঘরের মেয়ে যেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে, তেমনই করিয়া। তাহার কলঙ্ক সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিছু আসিয়া যায় না। তাহার রুগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে দেরি হয় না যে, তাহার অবশিষ্ট জীবন বৎসর বা মাস দিয়া গণনা করার প্রয়োজন নাই, বড়জোর কয়েকটি দিন বাকি।

মনে হইল, এই অসহায়া দুঃখিনী মেয়েটির জীবনে যদি কয়েক ঘণ্টার সামান্য আনন্দও দিতে পারি, তবে সে আনন্দ তাহার জীবনের অবশিষ্ট অতি অল্প কয়টি দিনের চরম দুঃখকেও ছাপাইয়া উঠিবে। আমার ও সুনীলের মুখের সাদৃশ্যটুকু সারদাবাবুর চোখে ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি তফাতও বুঝিয়াছিলেন। এই রুগ্না মেয়েটি তাহার অন্তর দিয়া শুধু সাদৃশ্যই গ্রহণ করিয়াছে, তাহার এই অসহ্য আনন্দের মুহূর্ত্তটিকে চূর্ণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

সাগ্রহে আমার হাত দুইখানি বুকের উপরে লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মীরা কহিল, এত দিন তুমি কেন আমাকে ত্যাগ ক'রে ছিলে, একবারও কেন এলে না?

কহিলাম, এই তো এসেছি মীরা।

সে তেমনই করিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু এত দিন? আমি কত চিঠি লিখেছি, একখানারও কোন জবাব দাও নি কেন?

উত্তর দিবার বিশেষ কিছু ছিল না। আমি শুধু তাহার রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম।

মীরা কহিল, আমি বুঝতে পারছি, আমি স্বপ্ন দেখছি, সত্যি কখনও এত সুখের হতে পারে না—অন্তত আমার জীবনে না।

বলিলাম, না মীরা, তুমি স্বপ্ন দেখছ না, আমি সত্যিই ফিরে এসেছি।

অনুভব করিলাম, আমার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সারদাবাবু ঠিক এক ভাবেই পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ফিরিয়া, অত্যন্ত অন্যায় এবং অত্যন্ত অসঙ্গত ভাবে তাঁহাকে আদেশ করিলাম, আপনি ঘুমোনগে যান।

সত্যসত্যই বিনাবাক্যব্যয়ে তিনি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত দেখিয়া তিনি এতটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন

যে, প্রতিবাদ করার, অথবা কৈফিয়ৎ চাওয়ার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার অবশিষ্ট ছিল না।

অভিনয় আরম্ভ করিলাম। অভিনয় করিয়া কখনও এত তৃপ্তি পাই নাই, অথবা কোন শ্রোতাকে এত তৃপ্তি দিতে পারি নাই।

হয়তো আমার সে অভিনয় অতি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। হয়তো নীতিশাস্ত্র ও সমাজবিধি অনুসারে আমি কঠিন অপরাধে অপরাধী। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। হয়তো ভগবানের চোখেও আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। কিন্তু আমার মনের গড়া এক নীতিশাস্ত্র আছে, যাহা চলিত প্রথার সহিত মিলে না। তাহা আমার কাছে সাধারণ নীতি, সমাজবিধি এ সকলের অনেক উপরে, এবং তাহার চোখে, আমার নিজের মনের চোখে আমি নিরপরাধ। ইহাই আমার কাছে যথেষ্ট।

সেই গভীর রজনীতে, জীর্ণ ক্ষুদ্র ঘরে, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় এক মৃত্যুপথযাত্রী শ্রোতার সম্মুখে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করিয়া চলিলাম। নিতান্ত সরল ও স্বাভাবিক। শ্রোতার একবারও মনে হইল না, ইহা মিথ্যা, ইহার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। অনেক প্রকার কল্পিত নায়িকার সহিত অনেক প্রেমের অভিনয় করিয়াছি, কিন্তু এই বাস্তব অভিনয়ের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না।

মীরা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার এ বউ খুব সুন্দরী, না?

বলিলাম, ছিঃ মীরা, ও কথায় আমি কষ্ট পাই, জান?

আমি যাহাতে কষ্ট পাই, মীরা তাহা প্রাণ গেলেও করিতে পারিবে না। মীরা দ্বিতীয় বার ও কথা মুখে আনিল না। কহিল, আজকের রাত্রি আমি ঘুমুব না। তোমাকেও ঘুমুতে দোব না। আমার মনে হচ্ছে, আজ আমার জীবনের শেষ রাত। আজকে তুমি সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকবে, সমস্তক্ষণ।

কহিলাম, না মীরা, আজ আমি ঘুমুব না, তোমার কাছেই থাকব।

মীরা কহিল, তুমি আমাকে ছেড়ে আর যাবে না? আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকবে?

সহসা কিছু জবাব দিতে পারিলাম না।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া মীরা করুণ কণ্ঠে কহিল, তুমি কথা বলছ না, তুমি নিশ্চয় আবার আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে।

এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আর একটি মিথ্যায় দোষের মাত্রা বিশেষ কিছু বাড়িবে না। তবু এই কথাটি বলার সময় গলা কাঁপিয়া গেল, বলিলাম, না মীরা, আমি চ'লে যাব না, তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকব।

মীরা আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু আমি জানি, আমি মীরার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকিব না। দিনের আলোয় তাহার চোখের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস আমার নাই। শুধু অকল্পিত সুখস্বপ্নের মত আসিয়া তাহাকে ক্ষণিকের মত সীমাহীন আনন্দের অধিকারিণী করিয়া রাত্রি-প্রভাতেই সুখস্বপ্নেরই মত মিলাইয়া যাইব। কিন্তু এই ক্ষণিকের সুখ তাহার জীবনের বাকি কয়টি দিন মধুর করিয়া রাখিবে।

আমাদের জীবনে আলোকের আবির্ভাব অহরহ হয় না, দুঃখের অন্ধকার রাত্রির মধ্যে ক্ষণিক তড়িতের মত সমস্ত দুঃখ রাঙাইয়া তুলে। সেই আনন্দের মুহূর্ত্তটুকু আমরা বহুদিনের সম্বল করিয়া রাখি আর একটি বিদ্যুৎ-চমকের প্রতীক্ষা করিয়া।

মীরার জীবনে বিদ্যুতের আবির্ভাব আর হইবে না। কিন্তু যাহা সে পাইল, তাহার মূল্য তাহার জীবনের মসীলিপ্ত বাকি দিনগুলির চেয়ে অনেক বড়।

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছে। একটি লাল রঙের ভাঙা টুকরা মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের ঘোর কালো আঁধার তাহার আগমনে পলায়ন করিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি প্রেমের অভিনয় করিলাম। ভোরের দিকে মীরা ঘুমাইয়া পড়িল। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম, সে ঘুম যেন তাহার না ভাঙে।

বাড়ি যখন ফিরিলাম, তখন বেলা প্রায় আটটা। শুনিলাম, সারা রাত ধরিয়া তিন-চারজন আমার খোঁজ করিয়াছে, এবং তাহাদের খুঁজিয়া আনিবার জন্য আরও তিন-চারজনকে পাঠানো হইয়াছিল, কিছুক্ষণ আগে তাহারা সকলে ফিরিয়াছে।

বাবা ও জ্যেঠামহাশয় কথা কহিলেন না। মা, খুড়ী ও জ্যেঠীর দল, সকলে মিলিয়া যে পরিমাণ গালাগালি ও লাঞ্ছনা করিলেন, তাহা শুনিলে চোরেও অপমানিত বোধ করে। আমি সমস্ত রাত যেখানে ছিলাম, সেখানেই যেন থাকি, এবং আমার দগ্ধ আনন যেন আর তাঁহাদিগকে, বিশেষ করিয়া মাকে, দর্শন করিতে না হয়, ইত্যাদি।

আমি স্থাণুর মত নিশ্চল, ও গীতায় উক্ত মহাপুরুষের মত নির্ব্বিকার ভাবে সমস্ত শুনিয়া গেলাম। কারণ, বলিবার মত কথা তাঁহাদের অনেক ছিল, এবং আমার একটিও ছিল না।

রাঙাদা তর্জ্জন করিয়া কহিল, তোর জন্যে কালকের রিহার্সালটা মাটি।

গম্ভীরভাবে কহিলাম, রাঙাদা, অভিনয় দু রকমের আছে। এক রকম অভিনয়, যা তোমরা বাঁশের খুঁটির ওপর ভাঙা খাট পেতে, ছেঁড়া সিন টাঙিয়ে ছ ফুট লম্বা পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষ সাজিয়ে গেঁয়ো অডিয়েন্সের সামনে কর, যেখানে অভিনেতা জানে সে অভিনয় করছে, দর্শকও জানে, অভিনয়ই—আর কিছু নয়। আর এক রকম—

রাঙাদা চটিয়া কহিল, ওঃ! কতবড় আমার পাব্লিক স্টেজের অ্যাক্টর রে!

আর এক রকম, যেখানে অভিনেতা জানে সে অভিনয় করছে, কিন্তু শ্রোতা তার প্রত্যেকটি কথা ধ্রুবসত্য ব'লে মনে করে, অবিশ্বাস করার কল্পনাও তার মনে আসে না।

আমার সম্পাদক-খুল্লতাত মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, থাক, আর জ্যাঠামো করতে হবে না।

জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (আড়ালে নায়েব) খুল্লতাত সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, কাল তোর কি কুক্ষণেই সকাল হয়েছিল রে!

অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলাম, কুক্ষণে, না পরম শুভক্ষণে, তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন?

স্বপ্নভঙ্গ

প্রসিদ্ধ অভিনেতা বিনোদ সরকার মারা গেছেন।

সমস্ত দেশের লোক আহা আহা করছে, বলছে, এমন অভিনেতা আর কোন দিন হয় নি। তারা জানে না যে, হঠাৎ আবেগের মাথায় তারা যা বলছে, তার অনেকখানিই সত্যি। এমন একদিন ছিল, যে দিন বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক; লোকে তাঁকে দানীবাবু-শিশিরবাবুর চেয়েও বড় বলত।

কিন্তু তিনি যে বড় অভিনেতা ছিলেন, সে কথা আজ নতুন ক'রে মনে পড়ছে; মাঝের তিন বছর পড়ে নি। বছর তিনেক আগে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর গলায় ঘা হ'ল, সেই থেকে কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর গেলে অভিনেতার কিছু থাকে না, তিনিও মঞ্চ থেকে অবসর নিলেন, স্বেচ্ছায় নয়, নিতান্ত অনিচ্ছায়। লোকে দিনকতক দুঃখ করলে, খবরের কাগজে ছবি বার হ'ল। তারপরে সবাই ভুলে গেল।

নতুন অভিনেতার দল এল, নতুন তাদের অভিনয়ের ভঙ্গি। কিন্তু গলার স্বর অমন ক'রে নষ্ট না হ'লে তাঁর পায়ের ধারে দাঁড়ানোর যোগ্যতা তাদের ছিল না। তবু সবাই তাদের সাদরে গ্রহণ ক'রে নিলে। যারা প্রথম প্রথম দিন কয়েক বলেছিল, বিনোদ সরকার এদের চেয়ে অনেক—অনেক বড়, ছ মাস, এক বছর, দু বছর পরে তাদেরও আর মনে রইল না। তাঁর দীর্ঘ গৌর দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সুগভীর কণ্ঠস্বর, পাদপ্রদীপের সামনে থেকে ভাল ক'রে স'রে যাবারও তর সইল না।

দুদিনের পুরোনো খবরের কাগজ যেমন বাসী, অবসরপ্রাপ্ত অভিনেতাও তেমনই।

আমারই ঘরে ব'সে কয়েকজন বন্ধু মিলে তাঁর কথা আলোচনা করছিলাম। একসঙ্গে তাঁর বহু নাটক দেখেছি, একবার দেখে আশ মেটে নি, তিনবার চারবার ক'রে দেখেছি। তাঁর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে প্রেক্ষাগৃহ গমগম করত, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তবু আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ নতুন ক'রে মনে পড়ল খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দেখে।

হয়তো সুদূরভবিষ্যতে যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস নতুন ক'রে লেখা হবে, তখন আবার তাঁর নাম যথোপযুক্ত সম্মান ফিরে পাবে। অল্প দূরের জিনিস ছোট দেখায়, বেশি দূরের জিনিস শুধু দূরত্বের গুণেই মহীয়ান হয়ে ওঠে। হয়তো সে ইতিহাসে বাস্তবের চেয়ে কল্পনাই থাকবে বেশি, শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের বইতে যেমন থাকে। কিন্তু সে কল্পনাকে মিথ্যে বলা চলবে না, কারণ এক ধরনের কল্পনা আছে, যা বাস্তবের চেয়ে সত্যি, কারণ তা বাস্তবের চেয়ে মধুর।

বছর-খানেক আগের একটা দিনের ঘটনা। কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় ফুট্‌পাথের উপর থেকে একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক কিনে ক্রস্‌ওয়ার্ডের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। পুরস্কার কোন দিনই পাই নি, তবু আশা ছিল, একদিন পেলেও পেতে পারি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা কর্কশ গলার স্বর কানে এল।

কি মশাই? ক্রস্‌ওয়ার্ড? উঁহু, ও পথে যেও না ভাই, ফটিংটিংয়ের ভয়। ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও।

অবাক এবং বিরক্ত হয়ে ফিরে দেখি একটা লোক, রোগা লম্বা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কটা চুল, গায়ের রং তামাটে।

তবুও চিনলাম। এই লোকটাই যে এককালে কলকাতার একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিল, কে বলবে!

বললাম, কি জানেন, লেগেও যেতে পারে। যদিও থিওরি অব প্রোব্যাবিলিটি—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিনোদ সরকার বললে, উঁহু, আশা করবে না। আশা পরমদুঃখং, নিরাশা—কি বলে গিয়ে—

হঠাৎ কি মনে ক'রে আমার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলে। তারপর বললে, তোমার নামটি কি ভাই?

খেয়ালের বশে মিথ্যে কথা বললাম, বললাম, বিনোদবিহারী মজুমদার।

সত্যিকারের বিনোদবিহারী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আশ্চর্য্য! আমার নাম জান?

জানি বইকি। আপনার নাম না জানে কে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলে গেল। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, বাঃ, বেশ। তুমিও বিনোদবিহারী, আমিও তাই। আমরা মিতে, কি বল?

চমৎকার।

চমৎকারই তো। চল মিতে, এক কাপ চা খাওয়া যাক।

এমন একদিন ছিল, যেদিন বিনোদ সরকারের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে চা খাওয়া ছিল পরমতম সৌভাগ্য, মর্ত্ত্যের মানুষের প্রায় নাগালের বাইরে। বললাম, বেশ তো, চলুন না।

চায়ের সঙ্গে দু তিন রকম খাবারও আনতে দিয়াছিলাম। বিনোদ সরকার কিছু খেলে না। শুধু চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

রেস্তোরাঁয় কয়েকজন ছেলে ব'সে থিয়েটারের গল্প করছিল। অনেক

দেশী বিলিতী স্টেজের ও সিনেমার অভিনেতাদের নাম শোনা গেল। কিন্তু কেউ বিনোদ সরকারের নাম করলে না।

বিনোদ সরকার একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললে, দেখলে তো মিতে, তুমি ভুল করেছিলে।

বুঝলেও বললাম, কি ভুল?

আমাকে কারও মনে নেই। এক তোমার মত জনকয়েক সেকেলে ছাড়া, যারা দু তিন বছর আগেও থিয়েটার দেখেছ। আশ্চর্য্য দেখলে, ওরা দু-তিনজনের নাম করলে, যারা অনেক দিন আগে ম'রে গেছে। আমি বেঁচে আছি, আমার নামটাই বাদ গেল।

অকর্ম্মণ্য হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে যে ম'রে যাওয়া অনেক লাভজনক, সে কথা ওর খেয়াল নেই। বললাম, গেলই বা বাদ, সমঝদারের কাছে আপনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

সে বিমর্ষ মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লে।

তার চা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম, আর এক কাপ দিক? সে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠল; বললে, কি? চা? না, থাক।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে চ'লে গেল, আমার দিকে না তাকিয়ে। অত্যন্ত অবাক হলাম, দুঃখিত হলাম তার চেয়েও বেশি।

অবাক হওয়ার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। কারণ ওর যে মাথা-খারাপ হয়ে গেছে, তা তো প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। তবুও ও যে এত কথার পর এ রকম অপরিচিতের মত উঠে চ'লে যাবে, এইটেই ভাল লাগছিল না।

চায়ের দোকানের মালিকের মুখ চেনা। একটা জীর্ণবেশ

পাগলাটে-গোছের লোকের সঙ্গে চা খেতে দেখে বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়েছিল। বললে, ও ভদ্রলোক কে মশায়? মুখটি যেন চেনা চেনা লাগল?

বিনোদ সরকারের নাম শুনেছেন?

অ্যাক্টর বিনোদ সরকার? সেই নাকি?

সেই।

ম্যানেজার আফসোস দেখিয়ে বললে, আহা, এত বড় লোকটার এই অবস্থা!

আমি উত্তর দিলাম না; চ'লে আসার সময় ম্যানেজার বললে, আগে জানলে একটু আলাপ করা যেত।

আগে জানলে আমিও ম্যানেজারকে দেখিয়ে বিনোদ সরকারকে বলতাম, দেখুন, আরও একজন আপনার নাম জানে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় কে যেন কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলে। পেছন ফিরে দেখি হিমাংশু ঘোষ। বললাম, খবর কি? কোন্ চোর ডাকাতের সন্ধানে বেরিয়েছ?

হিমাংশু ঘোষ আমার বহুদূরসম্পর্কের আত্মীয়, কলকাতা পুলিসের সাব-ইন্‌স্পেক্টর।

সে আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, ও লোকটির সঙ্গে অত খাতির হ'ল কি ক'রে? খুব তো একসঙ্গে চা খাচ্ছিলে!

আমি সবিস্ময়ে বললাম, তা রাস্তা থেকে না দেখে ভেতরে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেই তো পারতে!

সে বললে, সেই চেষ্টাতেই তো ছিলাম, হ'ল কই?

আমি বললাম, তুমিও তা হ'লে বিনোদ সরকারের নাম মনে রেখেছ দেখছি !

সে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, খুব ভাল ক'রেই রেখেছি।

আমি খুশি হলাম। বললাম, জান হিমাংশু, ওর ধারণা, ওর কথা সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু আমি এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখছি, আমি ছাড়া আরও দুজন লোক ওকে পরিষ্কার মনে রেখেছে।

হিমাংশু আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে বললে, তোমার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ চলছিল ?

ওর দুঃখ নিয়ে। মানুষ এত ভোলা-মন যে, এই সেদিনও ও যে অমন নাম-করা একজন অ্যাক্টর ছিল, তা অধিকাংশ লোকেই ভুলে গেছে।

হিমাংশু মৃদু হেসে বললে, অ্যাক্টর কিন্তু এখনও আছে—ফুট্-লাইটের পেছন দিকে নয়, সমস্ত মানুষের সামনে, তাদের মধ্যেই। তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল কোথায় ?

বললাম। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে, খানিকটা সময় নষ্ট করতে তোমার আপত্তি আছে ?

একটুও না।

তা হ'লে আমার সঙ্গে একটু ফাঁকা জায়গায় চল। এখানে বড় বেশি ভিড়।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের কাছে এসে বললে, ও এখন কি করে জান ?

কি ক'রে জানব ? মনে হয়, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

প্রিসাইস্‌লি ! কিন্তু পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও একটা মানে

আছে। আমাদের সন্দেহ, অর্থাৎ আমারই সন্দেহ, আর কাউকে কিছু বলি নি—ও চোরাই কোকেন-ব্যবসার দলে আছে।

আমার সন্দেহ হ'ল, হিমাংশুরই মাথা খারাপ হয়েছে। বললাম, ছোটনাগপুর অঞ্চলে রাঁচি ব'লে একটা খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে, জান?

ও রাগ করলে না। বললে, মধ্যে মধ্যে আমারই সন্দেহ হয়, আমিই বোধ হয় ক্ষেপে গেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও ঐ দলে আছে। শুধু প্রমাণের অভাবে—

চ'টে বললাম, তোমরা পুলিসের লোক, প্রমাণ দিয়ে কি করবে? প্রয়োজন এবং সন্দেহ হ'লে তোমরা অক্লেশে ভগবানকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতে পার ঘটিচুরির দায়ে। যাকগে, তোমার গালগল্প শুনে মাথা ধ'রে গেল।

সে হেসে বিদায় নিলে।

গঙ্গার ধারে হাওয়া খাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পকেট থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে দেখি, আরও একটা কি যেন ছোট্ট প্যাকেট রয়েছে, অনেকটা দেশলায়ের বাক্সের মত। আমি নিজে এটা পকেটে রাখি নি, আগে দেখিও নি। অবাক হয়ে প্যাকেটের ওপরের কাগজটা খুলে ফেললাম। ভেতরে সত্যিই একটা দেশলায়ের বাক্স। তার মধ্যে সাদা সাদা গুঁড়ো।

আমার পরম সৌভাগ্য, গঙ্গার ধারে তখন অন্ধকার। গুঁড়োটা যে কি, সেটা বুঝতে একটুও সময় লাগল না। প্যাকেটটা আবার ভাল ক'রে বেঁধে গঙ্গার মধ্যে ফেলে দিলাম, ছোট্ট একটু তরঙ্গ তুলে সেটা ডুবে গেল।

বিনোদ সরকারের অত তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান থেকে চ'লে যাওয়ার মানে এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। নিশ্চয় হিমাংশুকে সে দেখতে পেয়েছিল। তাই অলক্ষ্যে প্যাকেটটা আমারই পকেটে চালান ক'রে স'রে পড়ে, যাতে খানাতল্লাশ করলেও কিছু ধরা না পড়ে।

গঙ্গার ধারে ব'সেই রইলাম, সন্ধ্যা আস্তে আস্তে রাত্রিতে পরিণত হ'ল। আমার মনে হ'ল, একটা বাড়ি আমি নিজের হাতে গ'ড়ে আকাশ পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম, কে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে এক মুহূর্ত্তে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে।

সেই বিনোদ সরকার আজ মৃত। যে কণ্ঠস্বরে অতি সাধারণ নাটকের অতি সাধারণ চরিত্র মহান হয়ে উঠত, তা তিন বছর আগে নীরব হয়েছে। সত্যিকারের মৃত্যু তার সেইদিনই। আজ তার দ্বিতীয় মৃত্যু।

বন্ধুদের আলোচনা যখন দু ঘণ্টা ধ'রে চ'লে বিনোদ সরকারের প্রভূত গুণাবলীর বর্ণনা প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে, তখন সহসা উল্টো সুর বাজল। একজন বললেন, লোকটা নাকি অসম্ভব মাতাল ছিল।

বাকিদের মধ্যে দু-তিনজন সায় দিলেন। আর একজন বললেন, অতিরিক্ত মদেই তো গলা নষ্ট হয়ে গেল, নইলে—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তোমরা কেউ কিছু জান না। আমি বিনোদ সরকারের সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ পরিচিত ছিলাম, আমি জানি, তিনি ছিলেন মানুষ। সাধারণ মানুষের দোষ-ত্রুটি তাঁর যে না ছিল তা নয়, কিন্তু গুণ ছিল অনেক বেশি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোষ-ত্রুটির

কথা ভুলে যাও, তাঁর যে সব গুণে তোমরা মুগ্ধ হয়েছিলে, সেই সব মনে রাখ। শ্মশানের আগুনে তাঁর যা কিছু তুচ্ছ দুর্ব্বলতা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু একটা বিরাট অভিনেতা, একটা মহান্ চরিত্র, তার বেশি আমাদের জানার কিছু দরকার নেই।

বন্ধুরা সমস্বরে বললেন, AMEN!

পুনরাবৃত্তি

আমার জীবনের কুড়ি হইতে তিরিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মোটামুটি একাই কাটাইয়াছিলাম। তাহার পর সহসা বন্ধন আসিয়া জুটিল।

অবশ্য এ বন্ধন এক রকম আমি নিজেই চাহিয়াছিলাম।

একদিন খেলার ছলে হাসিকে বলিয়াছিলাম, হাসি, তোর মেয়েটাকে আমায় দিবি?

সে হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বেশ তো, নাও না।

আমার বয়স তখন সাতাশ, আমার জ্যেঠতুতো বোন হাসিরও আর তাহার মেয়ে মঞ্জুর বয়স তিন। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি। সারা দিনে রাতে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, মুখে মিষ্টি আধো-আধো কথার খই ফোটে। মঞ্জুকে আমার ভারী ভাল লাগিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, চার ছেলেমেয়ের মা হাসি তাহাকে যতটা আদরযত্ন করিতে না পারে, আমি বোধ হয় তাহা পারিব।

সেই খেলার ছলে বলা কথাই যে এমন নির্ম্মমভাবে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে জানিয়াছিল? কিন্তু সত্যই তিন বছর পরে মাতৃ-হীন মেয়ে মঞ্জুর ভার আমিই লইলাম, অনিচ্ছাসত্ত্বেই। এজন্য নহে যে তাহার ভার লইতে আমার আপত্তি ছিল। শুধু এই কথা ভাবিয়া চোখে জল আসিয়াছিল যে, একটা খেয়ালের কথা সত্যে পরিণত করিবার জন্য বিধাতার কি হৃদয়হীন প্রচেষ্টা!

সেই তিন বছরের পরে আরও তেরো বছর কাটিয়া গিয়াছে। এই তেরো বছর ধরিয়া মঞ্জুকে মানুষ করিয়াছি। বুঝিতেছি, আর বেশিদিন তাহাকে আমার কাছে রাখিতে পারিব না, নূতন দিনের কোন্ নূতন

মানুষের হাতে তাহার ভার আমার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়া পড়িবে, এবং আমার নিঃসঙ্গ জীবনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইবে।

আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কথা। এম. এস-সি. পাস করিয়া কিছুদিন নানাপ্রকার বড় বড় জিনিসের চেষ্টায় থাকিয়া পয়সাকড়ি যাহা ছিল, উড়াইয়াছি। পরিশেষে আবিষ্কার করিলাম, সরকারী ঈশ্বর-প্রেরিত চাকরি বিধাতাপুরুষ আমার জন্য প্রেরণ করেন নাই। অগত্যা অগতির গতি প্রফেসারি। কিন্তু প্রফেসারি চাকরি পাওয়া যতটা হাতের পাঁচ মনে করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহা নহে। তবু কিছু কিছু অস্থায়ীভাবে জুটিল। সেই অস্থায়ী চাকরির টাকার সহিত টিউশনির টাকা কিছু মিশাইয়া ভবিষ্যতের বেকারজীবনের সম্বলের জন্য রাখিয়া দিলাম। সে সুযোগও শীঘ্রই আসিল।

এই সময়েই সুলেখার সহিত পরিচয় হইল এবং বুঝিলাম, ঝটিকাবহুল সমুদ্রের মধ্যে সহসা পোতাশ্রয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

সুলেখাকে ভালবাসিয়াছিলাম। হয়তো সুলেখাও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সুলেখার অভিভাবকের সম্মতি মিলিল না, কারণ আমাদের সম্পর্ক এত নিকট যে, এ বিবাহে হিন্দুসমাজের পুরাপুরি নিষেধ না থাকিলেও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু আমি জানি, হয়তো সুলেখাও জানে যে, এ আপত্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, আসল আপত্তির কারণ আমার সম্বলহীনতা। যে চার বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাস করিয়া আজও একটা স্থায়ী কিছু জুটাইয়া লইতে পারিল না, তাহার অদৃষ্টে অবিশ্বাস।

সুলেখার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল, এবং যতদূর জানি সুলেখা আমার সহিত বিচ্ছেদের দুঃখে আকুল হইয়া উঠে নাই, বেশ শান্তভাবেই লক্ষ্মী মেয়েটির মত স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছিল।

আমি কিন্তু বিবাহে যাইতে পারি নাই, কাজেই অজুহাত দিয়াছিলাম, যদিও সেটা নিতান্তই বাজে কথা। আজ তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে সেদিনের ছেলেমানুষী দুর্ব্বলতার কথা মনে করিলে হাসি পায়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কোন্ নিভৃত অংশ যেন ব্যথিত হইয়া উঠে। সুলেখার জন্য নহে, সে দুর্ব্বলতা বহুদিন কাটাইয়া উঠিয়াছি ; যে বয়স আর কখনও ফিরিয়া পাইব না, সেই বয়সটুকুর জন্য।

মধ্যে মধ্যে ভাবি, সুলেখার কথা অত বেশিদিন মনে করিয়া না রাখিয়া একটা বিবাহ করিলেই তো চুকিয়া যাইত। বেশ তো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবৃত হইয়া প্রৌঢ় বয়সটা আরামে কাটানো যাইত। তখনই মনে হয়, একা মঞ্জুর হাতে মধ্যবয়স্ক শরীরটা ছাড়িয়া দিয়াই তো বেশ কাটিয়া যাইতেছে, আবার ওসব কথা কেন ?

যেন মঞ্জু চিরকাল আমার ছোট্ট মা-টির মত আমার খবরদারির জন্য থাকিবে, যেন সে নূতন জায়গায় নূতন সংসার পাতিবার জন্য যাইবে না।

প্রফেসারি করার আরাম যথেষ্ট আছে, অস্বীকার করা যায় না, কারণ কাজের স্বল্পতা এবং ঘন ঘন বিরামই নাকি আরামের প্রধানতম লক্ষণ। কিন্তু অসুবিধা এই যে, বছর বছর নূতন নূতন ছাত্রদলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বর্দ্ধিষ্ণু বয়সটা বড় বেশি করিয়া মনে পড়াইয়া দেয়।

আজ বয়সবৃদ্ধির কথাটা বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে, কারণ আজই তেতাল্লিশ পার হইয়া চুয়াল্লিশে পা দিলাম।

খবরটা ঢাক বাজাইয়া পাড়ার লোককে শুনাইবার মত নহে, তবু অসতর্কভাবে একজন নবাগত অধ্যাপককে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। বয়সবৃদ্ধির গৌরব নহে, আসন্ন বার্দ্ধক্যের দুঃখে।

নবাগত অধ্যাপক, ওরফে নির্ম্মল, খবরটা শুনিয়া সহসা অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল।

নির্ম্মল আমারই ছাত্র, এই কলেজ হইতেই বি. এস-সি. পাস করিয়াছিল। ছেলেটি মেধাবী, সুশ্রী এবং সচ্চরিত্র, এবং আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে। হয়তো সেই শ্রদ্ধার প্রতিদানেই আমি তাহাকে বিশেষ স্নেহ করি।

নির্ম্মল নিতান্ত ছেলেমানুষ, বয়স বছর ছাব্বিশ। আমারও একদিন ছাব্বিশ বছর বয়স ছিল, যদিও বিশেষ করিয়া সেই বয়সটা ভুলিতে পারিলেই আমি খুশি।

নির্ম্মল কারণে অকারণে আমার কাছে যাতায়াত করে, এবং তাহার আগমনে যে একটি প্রাণী বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাও আমার দৃষ্টি এড়ায় না। সেই রকম কোন সময়ে নির্ম্মল 'নেচারে' প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার সহিত আলোচনা করিতে সবিশেষ আগ্রহ দেখাইলেও আমি ঠাণ্ডা লাগার দোহাই দিয়া সরিয়া পড়ি। তাহাতে যে নির্ম্মল অথবা মঞ্জু বিশেষ দুঃখিত হয়, তাহাও কোন দিন মনে হয় নাই।

আমি চাই নির্ম্মল এবং মঞ্জুর সম্বন্ধ আরও নিকটতর হোক। অন্তত সেজন্য আমার দিক দিয়া যতটা করা সম্ভব আমি করিব, উভয়ের মিলনের পথে বিন্দুমাত্রও বাধা রাখিব না।

আমার নিজের ছাব্বিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়া আমার এই বয়সটার উপর একটা অহেতুক এবং হাস্যকর ভয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মনে হয়, যেন সারা যৌবনের মধ্যে এই বয়সটাই প্রেমের পথে সকলের চেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, এ বয়সের ভালবাসায় শুধু ব্যথাই আছে, আনন্দ বা সাফল্য নাই।

আজ আমার তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে আমি ভবিষ্যতের বার্দ্ধক্যের চিন্তায় যতখানি বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলাম, নির্ম্মল ঠিক সেই পরিমাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল, চমৎকার হয়েছে সার্, আজ আপনার ওখানে বিকেলে আমার চায়ের নেমন্তন্ন, বিকেলে পাঁচটার সময় যাব।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যের বিষয়, নিমন্ত্রণের কথাটা নির্ম্মল এমন সময় পাড়িয়াছিল, যে সময়ে ঘরে আর কেহ ছিল না। অবশ্য সেটা তাহারই স্ববিধার জন্য, কারণ আমার জন্মদিনটা নেহাৎই গৌণ; একটু সকাল সকাল আমার বাসায় গিয়া বেশি সময়ের জন্য বিশেষ কোন একটি লোকের সঙ্গলাভই যে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা না বুঝিবার মত বুদ্ধিভ্রংশ আমার এখনও হয় নাই।

বাড়ি আসিয়া মঞ্জুকে বলিলাম, মঞ্জু, আজ পাঁচটায় সময় দুজনের মত চায়ের বন্দোবস্ত রাখিস তো, একজনকে নেমন্তন্ন করেছি।

সে বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার জন্মদিনের জন্যে নাকি? আমি যে আবার আমার এক বন্ধুকে বলেছি।

বলিলাম, বেশ তো, না হয় আর একজন বাড়ল। তাতে আর কি? কিন্তু আমার জন্মদিনে তোর বন্ধু কেন?

বাঃ রে! তুমি অন্যবারে চুপিচুপি জন্মদিন পার ক'রে দিয়ে তার পরে বল, এবার যখন সময়েই বলেছ, তখন আমার এক বন্ধু এলই বা! তুমি অবশ্য মেয়েদের দুচক্ষে দেখতে পার না—

তাড়াতাড়ি ভীতভাবে বলিলাম, এসব কথা তোকে কে বললে?

বলবে আবার কে? সবাই তো জানে।

অগত্যা কথা চাপা দিতে হইল। কহিলাম, আমি কাকে নেমন্তন্ন করেছি, জিজ্ঞেস করলি না?

কাকে আবার, বিনোদ মামাকে ?

বিনোদ আমার আবাল্য বন্ধু এবং বর্ত্তমানে আমার এক গড়গড়ার ইয়ার।

বলিলাম, হয় নি, হয় নি, ফেল। আচ্ছা, আর একবার।

সহসা মঞ্জুর সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল ; কহিল, জানি না, যাও।

অর্থাৎ সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, কে আসিবে। আমি নলটা মুখে দিয়া অনেকখানি ধোঁয়া একসঙ্গে ছাড়িয়া তাহার আড়ালে নিঃশব্দে খানিকটা হাসিয়া লইলাম।

মঞ্জু সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্য তাহার সুগৌর বর্ণে অথবা মুখের গঠনের খুঁতহীনতায় নহে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যে। তাহার মায়ের রূপ সে পাইয়াছিল, আর পাইয়াছিল তাহার মায়ের বিদ্যুৎচঞ্চল ভাব।

নির্ম্মল যে মঞ্জুকে ভালবাসে, সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। ঈশ্বর যে সুখ, যে তৃপ্তি আমাকে দেন নাই, মঞ্জুকে সে সুখ, সে তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন না, সে আশা আমার ছিল।

নির্ম্মলের ঘড়ি সম্ভবত একটু দ্রুত চলে, পাঁচটার সময়ে নিমন্ত্রণ হইলেও সাড়ে চারিটা বাজিতেই সে আসিয়া হাজির হইল।

আমি বলিলাম, পাংচুয়ালিটির পরীক্ষা হ'লে তুমি একশোর মধ্যে শূন্য পেতে। তোমার ঘড়িতে কোথাকার সময় রাখ—জাভা, না জাপান ?

সে লজ্জিতভাবে একবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকাইয়া রহিল। কহিল, না, তা নয়, তবে চারটের সময় আমার ক্লাস শেষ হ'ল কিনা—ভাবলাম, আপনি একা আছেন—

যদি সত্যই সম্পূর্ণ একা থাকিতাম, এবং মঞ্জু নামক একটি প্রাণীর আমার বাড়িতে অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে সে কি করিত, তাহা

জানিবার একটা উৎকট ইচ্ছা হইলেও বেচারার লজ্জার মাত্রা আর বাড়াইলাম না। বলিলাম, বেশ তো, বেশ তো, একাই থাকি, তুমি মধ্যে মধ্যে একটু আসতে পারলে ভারী খুশি হই। তবে তোমরা ইয়ং-ম্যান, খেলাধুলোর দিকে—

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত টেনিস খেলার দিকে নির্ম্মলের প্রবল আকর্ষণ ছিল। আজ কিন্তু সে কহিল, খেলা তো আছেই, তবে আপনি একা থাকেন, তাই—

চাকরে গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল; আমি হাসি ঢাকিবার জন্য আবার ধূম্রলোকের আশ্রয় লইলাম।

মঞ্জু যে সহপাঠিনীটিকে আনিয়াছে, তাহার নাম নীলা। মেয়েটি মঞ্জুরই সমবয়সী এবং চমৎকার সুন্দরী। চাঞ্চল্য নাই, পরিবর্ত্তে আছে একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভাব।

আমার জন্মদিনের টী-পার্টি কেন যেন তেমন জমিল না। বুঝিলাম, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে নির্ম্মল এবং মঞ্জু তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতেছে না। আমি অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নই; আমার বয়স এবং কেশবিরল মস্তক যে কোন তরুণতরুণীর কাছে আমাকে উপন্যাসের অদৃশ্য মানুষের কোঠায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু নীলা না আসিলেই যে নির্ম্মল ও মঞ্জু উভয়েই খুশি হইত, তাহা অত্যন্ত সহজে বুঝিলাম।

আমি ভাবিতেছিলাম আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কথা। আমিও সেদিন এমনই করিয়াই নানা অজুহাতে শুধু একটি মানুষকে চোখের দেখা দেখিবার আশায় ও কয়েকটি কথা শুনিবার আশায় একটি বাড়িতে কথায় কথায় অনধিকার-প্রবেশ করিতাম। অনধিকার-প্রবেশ বইকি। শুধু সুলেখা ছাড়া আর কেহ আমার পায়ের শব্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত না,

কেহ ভাল করিয়া দুই একটা কথাও বলিত না। কেনই বা বলিবে? আমি ছিলাম সম্বলহীন ভবিষ্যৎহীন নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় একটি আপদ মাত্র। তবু সেখানে যাইতাম; যেদিন প্রবেশপথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল, সেদিন শুধু একটি প্রাণী চোখের জল গোপনে মুছিয়াছিল, সে সুলেখা। নিজের চোখে দেখিয়াছিলাম, তাই। না হইলে আজ আর বিশ্বাস করিতাম না। একটি মেয়ের অলক্ষ্য অশ্রুর ইতিহাস চির-অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, সে ছাড়া আর কেহ জানিত না।

কিন্তু হয়তো সেই ছিল ভাল! কি প্রয়োজন ছিল সেদিন সুলেখার চোখের জলের প্রহসন সৃষ্টি করার? অকারণে আমার মনে বিবেচনাহীন অহেতুকী আশা জাগাইয়া রাখার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? বিবাহ তো সে করিলই!

সেদিনের কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

বাহিরে রাত্রি অন্ধকার হইতে অন্ধকারতর হইয়া আসিতেছিল, শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ খানিকক্ষণের জন্য দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। আমার ছোট্ট ঘরখানিতে বসিয়া মনে হইয়াছিল, এ অন্ধকারের আবির্ভাব শুধু আমার জন্যই। এই তো অল্প দূরেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আর একখানি বাড়িতে একটি তরুণী, যে এই সেদিনও আমার সহিত বিচ্ছেদে চোখের জল ফেলিয়াছিল, সে তো আলোকমালার মধ্যে বিবাহ-বাসরে শতলোকের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত আর একটি লোকের হাতে হাত দিয়া চিরদিনের মত নিজেকে বিকাইয়া দিল। এই নূতন লোকটি আমার চেয়ে বড় কিসে? সুলেখার প্রতি প্রেমে? শুধু অর্থের সমারোহে। সে সেই জিনিসের অধিকারী, যাহার প্রাচুর্য্যে সব জিনিসই কিনিয়া লওয়া যায়, এমন কি প্রেমও।

আমার স্বল্পালোকিত ঘর মুহূর্ত্তে অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে হইল,

বাহিরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া রাত্রি আমার জন্য অধীর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, আমার যৌবনের সহিত নিশীথ-রাত্রির মিলন, আলোকের সহিত অন্ধকারের।

সে রাত্রিটা বাহিরেই কাটাইয়াছিলাম।

মঞ্জু ও নির্ম্মলের মিলনের পথে আমি কিন্তু কোন রকম বাধা রাখিব না। নির্ম্মল নিঃসম্বল না হইলেও ধনী নহে, তাহার প্রেমের স্থায়িত্বে আমি বিশ্বাস করি। মঞ্জুও সুলেখা নহে।

আমার নিঃসঙ্গ জীবনকে সঙ্গ দিবার জন্য নির্ম্মলের আগ্রহ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। কলেজে নির্ম্মলের সমবয়সী নবীন অধ্যাপকের দল আমার অনুপস্থিতিতে, এবং কখনও কখনও আমার উপস্থিতিতেই, নির্ম্মলকে হাসিঠাট্টার কেন্দ্র করিয়া তুলিল। আমি পরম আনন্দে দূর হইতে তাহা উপভোগ করিয়া চলিলাম।

এখন আর আমার চোখ এড়াইয়া চলিবার প্রয়োজন রহিল না, মঞ্জুরও না, নির্ম্মলেরও না। আমি বাড়ি না থাকিলেও আজকাল নির্ম্মল মধ্যে মধ্যে আমাকে সঙ্গদান করিতে আসে এবং আমি বাড়ি নাই শুনিলেও চলিয়া যায় না।

এমনই করিয়া কয়েক মাস চলিল।

শরৎ শেষ হইয়া হেমন্ত আসিয়াছে। তেতাল্লিশ যে চুয়াল্লিশের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়াছে, অল্প একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই শরীরের অবস্থা বুঝিয়া অনুভব করিতে পারি। তবু প্রথম প্রৌঢ়ত্ব হইতে সহসা যাহাতে বার্দ্ধক্যে না গিয়া পড়ি, তাই সকালে উঠিয়া গায়ে মোটা কোট চাপাইয়া সমস্ত মাথাটা ও কান দুইটি বালাক্লাভা টুপিতে ঢাকিয়া একটু ঘুরিয়া আসি।

বেশি দূর নয়, মাইল-খানেক, খুব বেশি ভোরেও নহে, প্রায় সাড়ে ছয়টার সময়।

কিন্তু তাহাতেই পঞ্চাশের নিকটবর্ত্তী শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া গেল। দিন-কয়েকের জন্য শয্যা আশ্রয় করিতে হইল।

অসুস্থ শরীরেও কিন্তু মঞ্জুকে খুব কাছে পাইতেছি না। নির্ম্মলের সর্দ্দিকাসির ছোঁয়াচ লাগার ভয় বড় বেশি, তাহা সত্ত্বেও রোজ একবার করিয়া দেখিতে আসে। ফলে খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘরে আমি একা পড়িয়া থাকি, মঞ্জু অথবা নির্ম্মল কাহারও অস্তিত্ব থাকে না।

ভাবিতেছি, ভালবাসিলে মানুষ বড় স্বার্থপর হইয়া যায়। না হইলে মঞ্জু, যে আমার দাড়ি কামাইতে গিয়া গাল কাটিয়া গেলে কাঁদিয়া ফেলিত, সে সর্দ্দিজ্বরগ্রস্ত এই প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসরের বৃদ্ধটিকে একা ফেলিয়া রাখিয়াছে একটি সুস্থ সবল যুবকের খাতিরে! অন্যায়, ভারী অন্যায়!

একটু জোরে ডাকিলে মঞ্জুকে কাছে আনা যায়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, তাহা হইলে উন্টা ফল হইবে। নির্ম্মল ও মঞ্জু উভয়েই আমাকে, অর্থাৎ এই অপদার্থ স্থবিরটাকেই স্বার্থপর ঠাওরাইয়া বসিবে। তাহার চেয়ে রামনাথের শরণ লওয়াই ভাল। রামনাথের ঘটে বুদ্ধি বেশি নাই, গরম জলের বোতল ঠিকভাবে সাজাইয়া রাখিতে সে জানে না, কিন্তু সে প্রেমে পড়ে নাই, এই সুবিধাটুকু আছে।

মোটামুটি রামনাথের যত্নেই শরীরটা সারিয়া উঠিয়াছে। আট দশ দিন পরে চেয়ার টানিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি।

খানিক আগে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত নির্ম্মল বিদায় লইয়াছে। হঠাৎ মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁরে, নির্ম্মলকে বেশ ভাল লাগে, না?

চঞ্চলা মঞ্জু সহসা স্থির হইয়া গেল। হাসিয়া কহিলাম, নির্ম্মলকে খুব ভালবাসিস ?

সে ধীরে ধীরে আমার চেয়ারের পিছনে আসিয়া ষোলো বছর আগের মঞ্জুর মতই নিঃশব্দে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

তা হ'লে নির্ম্মলকে বলি ?

জবাব পাইলাম না। মৌন সম্মতিলক্ষণ বুঝিয়া লইলাম।

নির্ম্মলকে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন হইল না। তাহার অভিভাবকের কাছে কথাটা তুলিবার ভার সেই লইল। ঠিক করিলাম, আমি শুধু গিয়া পাকাপাকি দিন স্থির করিয়া আসিব।

বাড়ি আসিয়া হঠাৎ মন-খারাপ হইয়া পড়িল। তেরো বছর ধরিয়া যে মঞ্জুকে নিজের হাতে এত বড় করিয়াছি, আজ সহসা তাহাকে বিদায় দেওয়ার চিন্তায় অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, আমার সঙ্গিহীন জীবনের আবার নূতন করিয়া যাত্রা স্বরু হইবে। নিজেকে অত্যন্ত স্বার্থপর বলিয়া মনে হইল। মনকে বুঝাইলাম, যে মঞ্জুকে তুমি অত্যন্ত ভালবাস, তাহার সুখের জন্যই তো এই বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদের দুঃখটা অত্যন্ত ছোট, মঞ্জুর সুখ তাহার চেয়ে অনেক বড়। কাঁটা দেখিয়াই যদি গোলাপ-ফুল অস্পৃশ্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তো আর চলে না।

দেখিলাম, মঞ্জুর চোখে জল। বুঝিলাম, আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথাটা আমার একারই লাগে নাই, তাহারও লাগিয়াছে। আমার নিজের বেদনা যেন অনেকটা সহনীয় হইয়া উঠিল। কহিলাম, কাঁদছিস কেন মা, তোর সুখেই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ। যাকে তুই ভালবাসিস, তার হাতেই যখন তোকে দিতে পারছি—

এইবার সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমার গলা জড়াইয়া

ধরিয়া কহিল, না মামা, তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না, কোথাও না।

বলিলাম, পাগলী কোথাকার! তুই ভাবছিস, তোর বুড়ো মামা চিরদিন বেঁচে থাকবে, আর তুই চিরদিন তার ছোট্ট মা হয়ে থাকবি? তা হয় না রে।

এই ধরনের একটা অবস্থার সম্ভাবনার কথা আগে হইতেই আমার মনে ছিল, মঞ্জুকে বুঝাইতে বেশি সময় লাগিল না।

কিন্তু পরের দিন নির্ম্মল আসিল না, তাহার পরের দিনও না।

ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। কলেজে গেলে খোঁজ পাওয়া যাইত, কিন্তু সত্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে উঠিয়াছি, এখনও দিন-কয়েক কলেজে যাওয়ার উপায় নাই।

হয়তো নির্ম্মলের শরীর অসুস্থ হইয়াছে আমার কাছে বেশি যাওয়া-আসা করার দরুন। খুব বেশি চিন্তিত হইলাম না।

কিন্তু মঞ্জু দেখিলাম একটু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক একবার কলেজে যাইব। আপাতত এক-খানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

সন্ধ্যার দিকে অগ্রহায়ণের ঠাণ্ডা একটু বেশি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল। ঘরের ভিতরে গিয়া ঈজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ান হইয়া কম্বল গায়ে দিয়া একখানা বিলাতী মাসিক খুলিয়া বসিলাম।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা আসিয়াছিল, রামনাথের ডাকে জাগিয়া উঠিলাম। হাত হইতে দুধের পেয়ালা লইয়া বলিলাম, দিদিমণি কই?

সে অত্যন্ত সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাইয়া চুপিচুপি কহিল, দিদিমণি ও ঘরে কাঁদছে।

চমকিয়া কহিলাম, কি করছে?

কাঁদছে।

আমার ঘুমের ঘোর মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। কম্বল ফেলিয়া মঞ্জুর ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

মঞ্জুর বিছানায় কয়েকখানি চিঠি ছড়ানো, তাহার মধ্যে একখানি লাল চিঠি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই পাশে বালিশে মুখ গুঁজিয়া মঞ্জু কাঁদিতেছে।

কম্পিত বক্ষে লাল চিঠি খুলিলাম। কয়েক লাইন পড়িয়াই অবসন্ন হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলাম।

নির্ম্মলের বিবাহ। নীলার সঙ্গে।

আরও একখানি চিঠিতে নির্ম্মলের বাবা সব কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন। মঞ্জুর সহিত বিবাহে তাঁহার আদৌ মত নাই, তিনি অন্যত্র নির্ম্মলের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পাত্রী আগে হইতেই পছন্দ করা ছিল, কাজেই আর উপায়ান্তর ছিল না। সমস্ত ঘটনার জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত, এবং আমি যেন মনে কোনও ক্ষোভ না রাখিয়া বরকনেকে আশীর্ব্বাদ করি।

চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, লাল চিঠিখানাও। মঞ্জু একবার মুখ তুলিয়া দেখিল মাত্র, কোন কথা কহিল না।

মঞ্জুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল মঞ্জু। চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, ভালই হয়েছে মামা, তোমাকে ছেড়ে আর আমায় কোথাও যেতে হবে না।

হয়তো ভালই হইয়াছে।

কিন্তু আমার মনে হইল বহুবর্ষ আগের একটি রাত্রির কথা। হইল, সেদিন যে অন্ধকারময় রাত্রি আমাকে সাদরে ডাকিয়া সঙ্গী জড়াইয়া

লইয়াছিল, আজ মঞ্জুর জন্যও সে তেমনই অধীর আগ্রহে বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছে। দুইটি মনের অন্ধকারের সহিত স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার মিশিয়া আমাদের চারিদিকের সকল আলো আবৃত করিয়া দিল।

মঞ্জু অনেকক্ষণ আমার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিল। আমি বাধা দিলাম না।

বলিলাম, মঞ্জু, আমাদের দুজনের অদৃষ্ট বিধাতাপুরুষ এক ছাঁচেই গড়েছিলেন ; তোর নির্ম্মল, আর আমার সুলেখা।

সে চোখ মুছিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, সুলেখা কে ?

আমার জীবনের যে বেদনার কাহিনী আমি এত দিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সমবেদনার সাথী পাইয়া তাহা সমস্ত উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলাম। আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের কথা, আমার সম্বল-হীনতার কথা, সুলেখার কথা, তাহার গোপন অশ্রুর কথা। সে নিঃশব্দে সব শুনিল।

শেষ করিয়া কহিলাম, পৃথিবীর লোকের ভালবাসা আমাদের অদৃষ্টে নেই ; তোরও না, আমারও না। আর আমাদের সে জিনিসে দরকারও নেই। আমরা দুই মা আর ছেলে মিলে আমাদের নিজেদের ভালবাসায় আর-সবার ভালবাসার অভাব পূর্ণ করব।

সে বলিল, সেই ভাল।

অনেক—অনেক দিন আগে যখন মঞ্জু ছিল শিশু, যখন তার মুখে ভাল করিয়া কথা ফুটে নাই, ঠিক সেইদিনের মত আসিয়া মঞ্জু আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। যেমন করিয়া ধরিয়াছিল, যেদিন নির্ম্মলের বাসার কথা তাহাকে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেইদিন।

দিদিমত্রি গভীর হইয়াছে।

চম্

সমস্তটা পড়া শেষ করিয়া হাসি বলিল, আমার কতকগুলো আপত্তি আছে।

বলিলাম, কি আপত্তি?

প্রথম কথা, তোমার বয়স তেতাল্লিশ নয়, সাতাশ। আমারও।

আর?

দ্বিতীয় আপত্তি, আমাকে অত চট ক'রে খুন করার কোন অধিকার তোমার নেই।

তা অবশ্যই নাই, স্বীকার করিতে হইল।

তৃতীয় আপত্তি তোলার আগেই হাসি বলিল, স্থলেখাকে আমি চিনতে পেরেছি।

পেরেছ তো কি করতে হবে?

কিছুই করতে হবে না, তবে স্থলেখার এখনও বিয়ে হয় নি।

এখনও না হ'লেও ভবিষ্যতে হবে।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। তা ছাড়া এখন থেকেই আমার মঞ্জুটাকে নিয়ে আবোল-তাবোল কল্পনা করায় আমার তৃতীয় আপত্তি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, কল্পনা কে বললে?

তবে কি? বাস্তব?

হাসির হাত হইতে কাগজের তাড়াটা ছিনাইয়া লইয়া বলিলাম, না, দুঃস্বপ্ন।

আঁখির ভাষা

মাতুল বলিলেন, তুই গেটের কাছে কাছে থাক, দেখবি, বাইরের লোক না ঢোকে।

যেন নিমন্ত্রিতদিগের ষোলো আনা লোককেই আমি চিনি।

বলিলাম, দেখুন, যাঁরা অভ্যাগত, তাঁদের সিকি ভাগকেও আমি চিনি না। কাকে তাড়াতে গিয়ে কাকে তাড়িয়ে বসব!

মাতুল চটিয়া বলিলেন, ভগবান ষাঁড়ের মত শরীর দিয়েছিলেন ব'লে কি বুদ্ধিটাও হাতীর মত হবে? ওরে বোকা, গেট-ক্র্যাশার দেখলেই চেনা যায়। জামা কাপড় যেন কেমন কেমন, ভাবভঙ্গিও সুবিধের নয়; আর সবচেয়ে বড় কথা—চোখ। চোখ দেখলেই চিনবি। ব'সে থাক এখানে।

মাতুল চলিয়া গেলেন। আমি লনের ধারে একটা চেয়ার টানিয়া বসিলাম।

ভগবান ষাঁড়ের মত শরীর দিয়াছিলেন এবং হাতীর মত বুদ্ধি দিয়াছিলেন; কিন্তু কবি করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কোনও তরুণীর চোখের মধ্যে যে কোনও দিন কোনও ভাষা খুঁজিয়া পাইল না, পাইলেও পাঠোদ্ধার করিয়া উঠিতে পারিল না, সে কি করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত রবাহূতবর্গের চোখের ভাষার অর্থ খুঁজিয়া পাইবে, বুঝিয়া পাইলাম না। সশঙ্ক অবস্থায় বসিয়া রহিলাম, কখন বা কোন্ গণ্যমান্য অতিথির অমর্য্যাদা করিয়া ফেলি!

মামাতো বোনের বিবাহ। মামা অর্থশালী লোক, মেয়ে সুন্দরী। বর আসিবার সময় হইয়া আসিল।

জল হইতে উঠাইলে সাধারণ মাছ চট করিয়া মরিয়া যায়। কইমাছের মত দুই একটি মাছ আছে, যাহারা বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া। এ পাড়ায় আসিলে চট করিয়া মরিয়া যাই না, কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি। আমি সাধারণ বংশের ছেলে, যে বংশের বংশমর্য্যাদা থাকিলেও অর্থমর্য্যাদা নাই; ফলে বাংলা দেশের অভিজাত-সমাজে প্রবেশেরও অধিকার নাই।

এখন পর্য্যন্ত এমন একজন লোকও চোখে পড়ে নাই, যাহাকে অনিমন্ত্রিত বলিয়া তাড়ানো চলিতে পারে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেছি, নিঃশব্দে উঠিয়া গেলে কেমন হয়, এমন সময় মাতুল রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একাকী নহে, বিমলদাকে সঙ্গে লইয়া।

বিমলদা বিলাতফেরত, পয়সাওয়ালা লোক, এবং খাঁটি অ্যারিস্টো-ক্র্যাট। বাংলা দেশে যথেষ্ট টাকা, অভাবপক্ষে যথেষ্ট ঋণ থাকিলেই অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায়, তাহার উপর বিমলদার মোটর গাড়ি আছে।

মাতুল বলিলেন, তোকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। তিন তিনটে লোক চুপিচুপি ঢুকে পড়েছিল, আমি তো দেখেই চিনলাম। বলামাত্র সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে গেল।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, কই, আমার তো চোখে পড়ে নি!

পোষাক দেখে হয়তো ধরতে পারিস নি, চোখের দিকে তাকিয়েছিলি?

স্বীকার করিলাম যে, আঁখির ভাষায় ততটা অধিকার হয় নাই।

আরে, সেইজন্যেই তো বিমলকে নিয়ে এলাম। ওর এসব দিকে চোখ আছে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা নেই। তোরা দুজনে থাক এখানে।

মাতুল চলিয়া গেলেন।

দুইজনে বসিয়া রহিলাম। সিগারেট খাওয়ার উপায় নাই। গুরুজনে বাড়ি ভর্ত্তি। ভিতরের লনের উপর মেরাপ বাঁধিয়া খাওয়ার জায়গা হইয়াছে। পরিবেশনকারীদের মধ্যে সমবয়স্ক ছেলেরা রহিয়াছে, সেখানে গেলে সময় কাটিত ভাল। আর একদল হল-ঘরের ভিতর মেয়েদের পরিবেশন করিতেছে, সেখানে স্থান পাইলে আরও ভাল হইত। অথচ বাহিরের গেটের কাছে বসিয়া আছি, সঙ্গী স্থুলদেহ বিরলকেশ এক অভিজাত, যে নিজের সম্বন্ধে ছাড়া আর কোনও বিষয়ে গল্প করিতে জানে না।

আশ্চর্য্য এই, আমি আধ ঘণ্টার উপর যেখানে থাকিয়া একটিও রবাহূত দেখিতে পাইলাম না, বিমলদা আসামাত্র সে স্থান যেন রবাহূতে ভরিয়া গেল। মিনিট পনরোর মধ্যে চারিজন লোককে অত্যন্ত অভদ্রভাবে বিদায় করা হইল।

আশ্চর্য্য লোকগুলির সাহস! বাহিরের দরজায় দুইজন বিপুলকায় দরোয়ান এবং সারা বাড়িভরা লোকের মধ্যে বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া আহার করিয়া যাওয়ার কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা! আর সকলকেই যে আমরা ধরিতে পারিয়াছি, তাহা কে বলিল! দুই-একজন সম্ভবত বিমলদার শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া এতক্ষণ চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সেবন করিতেছে।

বসিয়া বসিয়া হাই উঠিতেছিল। সামনের শ্বেতপাথরের চত্বরে সুবেশ কয়েকজন নিমন্ত্রিত গল্প করিতেছিলেন। দুই-তিনজনকে যে না চিনিলাম তাহা নহে, তবে অধিকাংশই অপরিচিত।

বলিলাম, বিমলদা, তুমি ওদের সবাইকে চেন?

বিমলদা বিনয় করিয়া বলিল, তা মোটামুটি প্রায় সবাইকেই চিনি।

আচ্ছা, ঐ যে বেলের মত চকচকে মাথা, পৌনে চার মণ ওজন, ইভ্নিং স্যুট প'রে এসেছে, ও লোকটা কে?

বিমলদা অবাক হইয়া বলিল, ওকে চিনিস না? ব্যারিস্টার এফ. জি. তলাপাত্র। ক্রিমিন্যাল সাইডে ওর জুড়ি নেই। মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করে। ফী হ'ল যাট জি এম.।

নাম শুনিয়াছি। চেহারা দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল না। একটি তরুণী অতিথিকে দেখাইয়া বলিলাম, উনি কে?

বিমলদা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, আলাপ করবি? ও হ'ল মিসেস চৌধুরী। সেদিন মিঃ চৌধুরী ওকে ডিভোর্স করেছেন। কো-রেস্‌পণ্ডেণ্ট ছিল আমাদের—

বাধা দিয়া বলিলাম, দরকার নেই।

এমন নিষ্পাপ শিশুসুলভ সরল মুখ আমি জীবনে কমই দেখিয়াছি। বয়স বছর ছাব্বিশ-সাতাশ হইবে, হঠাৎ দেখিলে আঠারো-উনিশের বেশি মনে হয় না। আরও বহু তরুণী রূপসীর মধ্যে তাহার মুখই সকলের আগে চোখে পড়ে।

অত্যন্ত বেঁটে, অত্যন্ত মোটা এবং অত্যধিক রুজ ও লিপ্‌ষ্টিক ঘষা দুইটি মেয়ে কথা বলিতেছিল সকলের চেয়ে বেশি। বিমলদা বলিল, ঋষ্যশৃঙ্গদের দেখছিস নাকি?

ঋষ্যশৃঙ্গ? ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখি, চুলের সামনের দিকটা উঁচু করিয়া এমন কায়দায় বাঁধা হইয়াছে যে, ভেড়ার শিং বলিয়া মনে করিলে দোষ হয় না।

এমনই আরও অনেক। ইহাদের কাহারও রূপ আছে, কাহারও রূপ না থাকিলেও অর্থ আছে। যাহার কিছুই নাই, তাহার প্রচুর ঋণ আছে।

প্রচুর না হইলেও সিগারেটের দোকানে আমার গোটাকয়েক টাকা ঋণ আছে, তাহারই জোরে ইহাদের ভিতরে ঢোকা চলে কি না

ভাবিতেছি, এমন সময় এমন একজন মহাত্মাকে দেখিলাম, যাঁহাকে এখানেও আশা করি নাই।

অর্থ ও নারী ঘটিত কতকগুলি ঘটনায় তিনি নিজের সমাজেরও অপ্রিয় হইয়াছিলেন। সে অর্থের কিছু আর অবশিষ্ট নাই। নারীঘটিত ব্যাপারের ফলে ইঁহার প্রথম পক্ষের পরমাসুন্দরী স্ত্রী আত্মহত্যা করেন, সে ব্যাপারের পরিণতিও অনেক দিন আগে হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরা এবং এ সমাজেও বিরল।

বিমলদা এসব বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওকে যে নেমন্তন্ন করা হ'ল। আমি নিজে লিস্ট দেখেছি, ওর নাম লিখে কেটে দেওয়া আছে।

বিমলদা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, কে বললে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল? ও বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছে। এ রকম সব জায়গাতেই যায়।

বলিলাম, আমাদের যা ডিউটি, তাই করা যাক, কি বল? ঘাড় ধ'রে—

বিমলদা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা কিরূপ হয় দেখিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ধীরপদক্ষেপে তিনি ভিতরে চলিলেন, আমিও গুপ্তচরের মত তাঁহার পিছু লইলাম।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র মাতুলের মুখ ঠিক ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, আরে মনোজ যে! এস এস।

নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত প্রায় নয়টা বাজে। দশটার আগে বাড়ি ফিরিতে না পারিলে সকালে উঠিতে পারিব না এবং অফিস যাওয়ার অসুবিধা ঘটিবে।

সাতটা হইতে এখন পর্য্যন্ত জন সাতেক রবাহূতকে উভয়ে মিলিয়া বিদায় করিয়াছি।

পরস্পরকে বুঝাইলাম, এখন আর কাহারও আসার সম্ভাবনা নাই।

টেবিলে নূতন করিয়া কাগজ এবং মাটির প্লেট বসানো হইয়াছে। দুইজনে একপাশে বসিয়া পড়িলাম।

আমাদের সারির শেষ চেয়ারে যে লোকটা বসিয়া আছে, তাহার ছিটের শার্টের ঘাড়ের দিকটা ছেঁড়া কেন? চুপ করিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়াই বা আছে কি জন্য?

বিমলদাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলাম, ওকে দেখেছ?

লোকটা সবে একটা ভেটকিমাছের ফ্রাই চিবাইতে সুরু করিয়াছে। বিমলদা চেয়ার সরাইয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

লোকটার হাত কাঁপিয়া জলের গেলাস পড়িয়া গেল। বিমলদা অতি মিষ্টস্বরে প্রশ্ন করিল, কোন্ পক্ষের? বরপক্ষের, না মেয়ে-পক্ষের?

লোকটা জড়িতস্বরে কি বলিল, বোঝা গেল না। আমি একটু গলা চড়াইয়াই বলিলাম, শত্রুপক্ষের।

বিমলদার বাহাদুরি আছে। উচ্ছিষ্ট হস্তে অতগুলি লোকের মধ্যে যে রকম ভাবে অর্দ্ধচন্দ্র ও পাদুকা-প্রহার সহকারে লোকটাকে বিদায় করিল, তাহা না দেখিলে উপভোগ করা যায় না। লোকটার ঘাড়ের পিছন দিকে জামা একটু ছেঁড়া ছিল, একটা টান দিতেই পিঠ পর্য্যন্ত ফাঁক হইয়া পড়িল। দরোয়ান জলন্ধর সিং ও মোবারক লোকটাকে চ্যাংদোলা করিয়া লইয়া গেল। এত মার খাইয়াও লোকটা কাঁদিল না।

আহাররত অন্য সকলের কিন্তু গোটাকয়েক করিয়া ভেটকির ফ্রাই ও চপ খাইয়াই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

একজন বলিলেন, খাওয়ার সময় একটা কমিক কিছু হওয়া দরকার। হাসতে হাসতে খেলে হজম হয় ভাল। সেকালে ব্যারনরা এইজন্যে ক্লাউন রাখত।

মাছ পর্য্যন্ত খাওয়া শেষ হইয়াছে। এইবার চিংড়িমাছের মালাই-কারি। এ বাড়ির মেনু আমার কণ্ঠস্থ। কিন্তু কাট্‌লেটটা ভাজিয়াছিল ভাল। আর খান দুই পাওয়া যায় কি না ভাবিতেছি, এমন সময় আমার বাঁ পাশের লোকটির দিকে নজর পড়িতেই থ হইয়া গেলাম।

আগের লোকটার জামা শুধু ঘাড়ের কাছটা ছেঁড়া ছিল, ইহার হাতের কাছে ছেঁড়া, বুকের কাছে ছেঁড়া এবং পিঠের কাছে ছেঁড়া। আগের লোকটার দোহারা গড়ন ছিল, এ লোকটা অতি শীর্ণ। অতএব ইহার নামেও যে বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইবার ও নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিবার অনুরোধ সমেত পত্র যায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু বড় বেশি দেরি হইয়া গিয়াছে। এখন ইহাকে তুলিতে গেলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইবে। কাজেই অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম।

মানুষের মনের মধ্যে একটা করিয়া জানোয়ার লুকাইয়া থাকে, সে মানুষের যন্ত্রণা দেখিলে পরমানন্দ উপভোগ করে। এ কথাটা মনস্তত্ত্বের বই হইতে মুখস্থ বলিতেছি না, নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি।

অকারণে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট বিমলদাকে বলিলাম, বিমলদা, এখনও দুই-একজন মহাত্মা দিব্যি কালিয়া টানছেন, দেখতে পাচ্ছ?

শুধু বিমলদা নয়, উপস্থিত সকলেই এদিক ওদিক তাকাইল, এবং অপরাধীকে দেখিতেও পাইল অনেকেই।

একজন বলিলেন, এখন টূ লেট!

কথাটা সত্য। হাত নিসপিস করিতেছিল। হাত-ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় মুখের ব্যবহার সুরু করিলাম।

কাট্‌লেট আসিয়াছিল। বলিলাম, ওহে, এঁকে দাও। পরিবেশক খান-তিন-চার কাট্‌লেট দিয়া গেল।

লোকটার হাত যেমন করিয়া কাঁপিতেছে, তাহাতে কাট্‌লেট খাওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। সে কাট্‌লেট লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল মাত্র, দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া।

মালাইকারি সে লইলই না।

মাংসের বেলাতেও যখন হাত নাড়িল, তখন আমি বলিলাম, সে কি মশায়? মাংস খাবেন না? ওহে, দাও দেখি ভাই, এঁকে একটু ভাল ক'রে। ইনি পাঁঠার কালিয়া খেতে বড্ড ভালবাসেন।

একটা হাসির রোল উঠিল। লোকটা কম্পিত হস্তে এক টুকরা মাংস নাড়িতে গিয়া নিজের জামা-কাপড়ে খানিকটা ঝোল ফেলিয়া দিল।

আমি পরম সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম, চ্‌ক্‌ চ্‌ক্‌। করলেন কি? যাক, বাড়ি গিয়ে জামা কাপড় বদলে ফেললেই হবে, কি বলেন?

লোকটা কিছুই বলিল না; শুধু তাহার শীর্ণ দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বিমলদা বলিল, এখন তো এ লাইনের ট্রাম পাবি না, চল, রসা রোডের মোড় পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাস্তার উপর আর একটা বিয়েবাড়ি। কাজকর্ম্ম চুকিয়া আসিয়াছে, বিপরীত দিকের ফুট্‌পাথের উপরে ডাস্ট্‌বিন ভুক্তাবশিষ্টে পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে।

কতকগুলি কুকুর ও কয়েকটা ভিখারী সেখানে ঝগড়া মারামারি করিতেছে। একটা ভিখারিণী একটু দূরে বমি করিতেছে।

ডাস্ট্‌বিনের ময়লা কুড়াইয়া খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়।

নিমন্ত্রণ-বাড়ি হইতে পুরা এক টিন সিগারেট সরাইয়াছিলাম, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সেইটা খুলিয়া একটা সিগারেট বাহির করিতেছি, বিমলদা অপাঙ্গে চাহিয়া বলিল, ওর অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য।

পকেট হইতে একটা শূন্যপ্রায় টিন, নিঃসন্দেহ নিমন্ত্রণ-বাড়িরই, বাহির করিয়া বলিল, দে।

বিনা বাক্যব্যয়ে গনিয়া গনিয়া পঁচিশটা সিগারেট বাহির করিয়া দিলাম।

হিসাব-নিকাশ

জেরোম কে. জেরোম এক রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সম্ভবত সৎকার্য্যের মাত্রাধিক্যের ফলেই একদিন সহসা তিনি অনুভব করিলেন, শূন্যপথে সবেগে চলিয়াছেন। অতটা সৎ কাজ না করিলে হয়তো আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন।

অসীম গগনে এক দেবদূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হাতে তাঁহার পাপপুণ্যের জমা-খরচের হিসাবের খাতা। খ্রীষ্টমাসের এক পক্ষ পরের কথা। জেরোম এই কয় দিনে যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু খাতা খুলিয়া দেখা গেল, তাঁহার সমস্ত পুণ্যের হিসাব নির্ব্বিচারে খরচের ঘরে উঠিয়াছে, তাঁহার ভণ্ডামি, অহমিকা এবং সকল রকম ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপের সহিত একত্রে। পুণ্যের ঘরে শুধু একটি অঙ্ক—কবে তিনি ট্রামগাড়িতে জীর্ণবাসা অর্দ্ধসুপ্তা এক বৃদ্ধাকে নিজের আসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাই। আর কিছু নয়।

জীবন-খাতার যতগুলি পাতা খরচ করিয়াছি, তাহাতে লেখার পরিবর্ত্তে বোধ হয় কালি ছিটাইয়া মলিন করিয়াছি অনেক বেশি। মানুষ ছোটখাটো পাপ যত রকম করিতে পারে, সব করিয়াছি। আইনের দরবারে সেসব অপরাধের জন্য শাস্তিবিধান নাই, এক পরের মাসিক-টিকেট লইয়া ট্রামে বাসে ভ্রমণ ছাড়া। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা পাপই, পুণ্য নহে; নিজের চোখেও নহে।

পুণ্যের ঘরে কি কিছুই নাই? কে বলিল? আট বছর বয়স হইতে সুরু করিয়া পনরো বছর পর্য্যন্ত নিয়মিত বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায়

হরিসংকীর্ত্তনের দলের সহিত বাহির হইয়া দুই বাহু তুলিয়া উদ্দাম নৃত্য করিয়াছি। সরস্বতীপূজার পূর্ব্বরাত্রে ধনী প্রতিবেশীর বাড়ির বাগান উজাড় করিয়া ফুল চুরি করিয়া আনিয়াছি। অগণিত কানা, খোঁড়া, বোবা, কালা, খোনা এবং নুলো ভিখারীকে যে পরিমাণ পয়সা ও আধলা সারাজীবনে দান করিয়াছি, সব একত্র করিলে যে কত টাকা হয়—মোটের উপর অনেক টাকা হয়। অতএব পুণ্যের খাতা শূন্য নয়।

অবশ্য যে বয়সে মানুষ পাপপুণ্যের খতিয়ান লইয়া আখেরের দিনের ভয়ে বিহ্বল হইয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় খোঁজে, এবং রামপাখী চর্ব্বণ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরিতালের ছাপ লাগাইয়া চিতাবাঘ হইয়া বসিয়া থাকে, সে বয়স আমার আসে নাই। কারণ বয়স আমার তিরিশের এধারেই এবং যে পরিমাণ পাপ করিলে উপরোক্ত প্রতিষেধকের প্রয়োজন হয়, তত পাপও বোধ হয় করি নাই। অন্য কারণ আছে।

আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া মনে হইল, এমন সুন্দর সকাল কমই দেখিয়াছি। গত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে এত ভোরে আর উঠি নাই। মনে পড়িল, আজ বসন্তের প্রথম দিন, পয়লা ফাল্গুন, আমার জন্মদিন।

পঁচিশে বৈশাখ যতখানি বিখ্যাত, পয়লা ফাল্গুন এখনও ততটা হয় নাই। শুধু ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া আছি। স্বনামখ্যাত মিঃ মিকবারের মত।

নববর্ষের দিন প্রভাতে অনেকে সৎকার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। আমি ঠিক করিলাম, জীবনের গত আটাশ বৎসর যেমন করিয়া হেলায় কাটাইয়াছি, তেমন আর চলিবে না, বৃহত্তর মহত্তর ভাবে নূতন জীবনের উপক্রমণিকা করিতে হইবে।

বাড়ির সকলের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিলাম। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন, কারণ ঘুম ভাঙিবার পরে খানিকটা সময় পর্য্যন্ত আমার মেজাজ খুব উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা থাকে, নামিতে সময় লাগে।

ট্রামে কণ্ডাক্টর যখন দুই মিনিটের মধ্যে দুই-দুইবার টিকেট দেখিতে চাহিল, তখন অভ্যস্তভাবে দাঁত খিঁচাইলাম না। রাস্তায় জনৈক বৃদ্ধ যখন অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহাকে এক নিকট এবং মধুর আত্মীয়তার সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলাম না।

অর্থাৎ নূতন জীবনের গোড়াপত্তন ভালভাবেই হইল।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার, অবান্তর মনে হইতে পারে, কিন্তু সত্যই অবান্তর নয়।

আমি একটি তরুণীকে ভালবাসি। বাংলা দেশে বিবাহের পূর্ব্বে কোন তরুণীকে ভালবাসা সমাজানুমোদিত নয়, এ কথা জানা সত্ত্বেও। মেয়েটির বাড়িতে আমি খুব বেশি যাওয়া-আসা করি না, কারণ অতিরিক্ত দর্শনে প্রেমের ঔদার্য্য খাটো হইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ওপক্ষ হইতে খুব একটা উৎসাহ পাই নাই। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় কারণ, মেয়েটির অভিভাবকদের মৌন আপত্তি।

হিসাব করিয়া দেখিলাম, কমপক্ষে দুই মাস আগে শেষ সে বাড়িতে গিয়াছি। অতএব আজ সন্ধ্যায় যদি একবার অকস্মাৎ উপস্থিত হই, তবে অভিভাবকগণ তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা নাও করিতে পারেন।

তাহা ছাড়া আজকের দিনটা যে ভালভাবে কাটিবে, তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাইয়াছি। বালিগঞ্জের মাসিক-টিকিট লইয়া টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছি, কণ্ডাক্টর

ধরিতে পারে নাই। খানিকটা সম্মান এবং এক আনা পয়সা, দুইই বাঁচিয়াছে।

সুতরাং অন্তত এই দিনটা আমার অদৃষ্টে সুপ্রসন্ন। হয়তো মেয়েটি আজ অন্য দিনের মত আমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে অন্তর্হিত হইবে না। হয়তো হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, ভাল আছ?

তাহার মুখের ঐ হাসিটুকু দেখিবার জন্য ও ঐ দুইটি কথা শুনিবার জন্য আমি টালা হইতে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রখর রৌদ্রে অথবা শ্রাবণের ধারাবর্ষণের মধ্যে হাঁটিতে রাজি আছি।

ব্যর্থ প্রেম নামক জিনিসটি সাহিত্যে প্রথম কে আমদানি করিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু বাস্তব জীবনে সার্থক প্রেম আর কতটুকু? তবে সাহিত্যে বিষয়টা পুরানো হইয়া পচিয়া প্রায় পোকা ধরিয়া গেল, আর ভাল লাগে না।

তবু লিখিতেছি।

এ বাড়িতে এত আন্তরিক অভ্যর্থনা বোধ হয় আর কোন দিন পাই নাই। অবাক হইলাম। আমার অন্তরলক্ষ্মীর অভিভাবক বলিলেন, এসেছিস বাবা, বেশ হয়েছে। একটু ধ'রে ধ'রে চিঠিখানা রবি-ঠাকুরী কায়দায় লেখ দেখি, ব্লক করাতে হবে।

কি চিঠি, কেন চিঠি, কিসের চিঠি?

আমারই প্রিয়তমার অদূরভবিষ্যতে বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। একটি সুপাত্র পাওয়া গিয়াছে। অথচ আর একটি সুপাত্র যে এই বাড়িরই আশেপাশে চোরের মত এতদিন ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার দিকে কাহারও নজর পড়িল না।

সুকুমার ছেলেটিকে দেখা অবধি অকারণে তাহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। একদা নিজের সুপুরুষ বলিয়া গর্ব্ব ছিল, সুকুমার সাক্ষাৎ কন্দর্প। তাহার পাশে দাঁড়াইলে আমাকে আপোলোর পাশে ভাল্‌কানের মত দেখায়, অতএব বিতৃষ্ণা নিশ্চয়ই ঈর্ষাজনিত।

কিন্তু সেই সুকুমারই যে হৃদয়ের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে এবং অক্লেশে জয়লাভ করিবে, তাহা কে জানিত? ইচ্ছা হইতেছে—

কিন্তু না, আজ ভোরবেলায় প্রতিজ্ঞা করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছি, আর আজই সায়াহ্নে সুকুমার নামক একটি যুবকের মস্তক তৈলসিক্ত বংশদণ্ডসহকারে চূর্ণ করিবার ইচ্ছা চলিতে পারে না। মনকে সংযত করিলাম। দুই কান গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সামলাইয়া লইলাম।

বলিলাম, দিন, লিখে দিচ্ছি।

হাত একটুও কাঁপিল না। অনায়াসে লিখিলাম, "সবিনয় নিবেদন, আগামী—" ইত্যাদি। হাতের লেখা দেখিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন, আমি স্মিতমুখে সলজ্জ নতমস্তকে প্রশংসা গ্রহণ করিলাম।

ভাবিয়াছিলাম, এইখান হইতেই সোজা বাহির হইয়া পড়িব, শুধু দুর্ব্বলতার বশে পারিলাম না। প্রশ্ন করিলাম, সে কোথায়?

সে পাশের ঘরেই ছিল। দেখা হইল। মুখে তাহার প্রভাত-সূর্য্যের নবারুণ আভা, ব্রীড়াবনত দেহ। বলিল, ভাল আছ?

আশ্চর্য্য! এক ঘণ্টা আগে শুধু এই দুইটি কথার জন্য আমি অসাধ্য-সাধন করিতে প্রস্তুত ছিলাম, এখন আর মনে একটুও সাড়া জাগিল না। মনে হইল, অতি সাধারণ প্রশ্ন; উত্তরও দিলাম অতি সাধারণভাবে, বলিলাম, ভালই আছি।

আগে যাহা কোন দিনও করে নাই, আজ সে সহসা তাই করিয়া ফেলিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্রসন্ন হাস্যে বলিলাম, সুখী হও বোন।

কোন্ ক্ষেত্রে প্রিয়তমা এক মুহূর্ত্তে ভগ্নীতে পরিণত হয়, জানিতাম।

সে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখের রক্তোচ্ছ্বাস দেখিতে পাইলাম না।

উদারভাবে বলিলাম, সুকুমার চমৎকার ছেলে, খাসা ছেলে!

সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার মধুর হাস্যে বলিলাম, তোমরা দুজনে সুখী হও।

সে তেমনই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার সময়ে শুনিলাম, অভিভাবিকা বলিতেছেন, আহা, মনীশ ছেলেটি বেশ। অন্তত শ দেড়েক টাকাও যদি মাসে রোজগার করত! তা হ'লে—

মুহূর্ত্তের জন্য বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সত্যই তো! অন্তত দেড়শো টাকাও যদি মাসে রোজগার করিতে পারিতাম! কিন্তু আজকের আমি অন্য দিনের আমি নই, মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া গেল।

বাহির হইয়া আসিলাম।

আমি এতদিন ধরিয়া বনফুল চয়ন করিয়া অক্ষম হাতের যে মালা দেবীর চরণে নীরবে অঞ্জলি দিয়া আসিলাম, আজ সহসা যদি নূতন পূজারীর নবগঠিত পুষ্পমাল্য তাহার স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে বলিবার কি আছে? দূর তারকার জন্য ক্ষীণশক্তি ভূসঞ্চারী পতঙ্গের তৃষ্ণা কবে সফল হইয়া থাকে?

আমার ব্যর্থ সাধনার নিবিড় লজ্জা আমার অন্তরের গোপন গিরি-গুহায় সঞ্চিত থাকুক, দেবতাকে তাহা জানাইয়া কাজ নাই।

মনটা একটু খারাপ হইয়াই ছিল। অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছি, হঠাৎ কানে আসিল, হ্যাঁ বাবা, একটু শুনবে?

একটি প্রৌঢ়া। বলিলাম, কি? শুনিলাম, তাহার অবিলম্বে শ্যামবাজার যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কাছে মাত্র চারিটা পয়সা থাকায় যাওয়া সম্ভব হইতেছে না। হাঁটিয়াই যাইত, তবে উপস্থিত পায়ের "ব্যামো", অতএব—

মনে পড়িল, ইহাকে আগেও দেখিয়াছি এবং শ্যামবাজার গমনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা এবং পায়ের "ব্যামোর" গল্পও শুনিয়াছি। তবু এক আনা পয়সা বাহির করিয়া দিলাম।

পকেটে অনেকগুলি খুচরা পয়সা ছিল। ঠিক করিলাম, আজ সন্ধ্যায়ই সব শেষ করিব ভিখারীবৃন্দকে দান করিয়া, তাহারা দানের যোগ্য হউক অথবা নাই হউক।

কিছুদিন আগের কথা মনে পড়িল।

রাস্তার উপরে একজন ভিখারী হাত পাতিল; নগ্নপ্রায় দেহ, এক পা খোঁড়া। দয়ার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। পকেটে হাত দিলাম এবং শূন্য হাত বাহির করিয়া আনিলাম। কিছু নাই বলিয়া নহে, যাহা আছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম মুদ্রার পরিমাণ চারি আনা এবং তাহা ভিক্ষুককে দেওয়া চলে না।

প্রসারিতহস্ত ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া রহিল, আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম।

মণিমঞ্জুষায় কুবেরের ধনভাণ্ডার রহিয়াছে। চাবি কাছেই আছে, কিন্তু হায়, এত বড় চাবি অতটুকু তালার কোনও কাজে আসিল না, রত্নসম্ভার যেমন তেমনই রহিয়া গেল।

তুমি পৌষ মাসের শীতে নগ্নদেহে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আছ। জামা তোমার সঙ্গেই আছে, কিন্তু গায়ে দেওয়ার উপায় নাই, গায়ে বড় হয়। তোমার সঙ্গে আবরণ, তুমি নগ্নদেহে দাঁড়াইয়া রহিলে, পৌষের রাত্রি তোমার উপর হিমকণা বর্ষণ করিয়া চলিল।

কিন্তু আজ আর তাহা নয়। যতগুলি প্রার্থী আসিল, সকলকে দান করিলাম, তাহার পরেও আরও একজন আসিল। পকেটে হাত দিলাম, শুধু একটি সিকি। অকাতরে বাহির করিয়া দিলাম; চলিতে চলিতে কানে আসিল, সন্দিগ্ধ ভিক্ষুক সিকিটাকে একটা পাথরের উপরে বাজাইতেছে, শব্দ আসিতেছে।

আরও একজন। অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিলাম। পকেট শূন্য।

কিছুই দিতে পারিলাম না। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিলাম।

রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, মহাবেগে শূন্যমার্গে চলিয়াছি, আমি একাকী, চারিদিকে আলোকহীন মহাশূন্য। চিরপরিচিত ধরিত্রীর কোনও চিহ্ন নাই।

বুঝিলাম, ইহলোকের লীলাখেলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু কোথায় যাইতেছি? স্বর্গে, না নরকে?

স্বর্গ উপরে এবং নরক নীচে—এই রকম একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণা

মাথায় রহিয়াছে। খানিকক্ষণ ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম—উঠিতেছি, না নামিতেছি, পারিলাম না।

যে কোন বৈজ্ঞানিককে প্রশ্ন করিলেই উত্তর পাওয়া যাইবে, পৃথিবীর বাহিরে উর্দ্ধ, অধঃ, দক্ষিণ, বাম, এ সকল নাই। ধাঁধায় পড়িলাম, তবে চলিয়াছি কোথায় ?

হিসাব করিয়া দেখিলাম, আজ সারাদিনে যে পরিমাণ পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে স্বর্গবাস অনিবার্য্য। ট্রাম-কোম্পানিকে ঠকানোর কথা মনে পড়িল না। অতএব স্বর্গেই যাইতেছি। মনটা খুশি হইয়া উঠিল।

মহাশূন্যে যেমন দিক বলিয়া কিছু নাই, সেই রকম সম্ভবত সময় বলিয়াও কিছু নাই। কাজেই কতক্ষণ চলিয়াছি বুঝিলাম না। এক মুহূর্ত্তও হইতে পারে, শত বর্ষ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

জেরোম কে. জেরোম শূন্যমার্গে যে দেবদূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহার চেহারা অথবা বেশভূষার বর্ণনা দেন নাই। তবে নিঃসন্দেহ সে সেমিটিক ধর্ম্মশাস্ত্রের দেবদূত অর্থাৎ ইহুদী। কিন্তু আমার সহিত এইবার যাহার সাক্ষাৎ হইল, তাহার সঙ্গে ইহুদী দেবদূতের কোনও সম্পর্ক নাই।

পরিধানে পীতবর্ণ ধুতি, শুভ্র সুগঠিত পেশীবহুল নগ্ন বক্ষ। অর্থাৎ আর্য্যস্বর্গের দেবদূতের যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই। খালি মার্চেণ্ট অফিসের লেজারের মত একখানা খাতা ও কটিবন্ধে একটি ফাউণ্টেন পেন একটু বেমানান ঠেকিতেছিল।

জেরোমের কথা মনে ছিল। চিনিতে বিলম্ব হইল না। বলিলাম, নমস্কার।

সে স্মিতহাস্যে প্রতিনমস্কার করিল।

একটু ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বুঝি গাইড?

সে কথা কহিল না। শুধু একটু মৃদু হাসিল। দেবদূতের হাসি!

বলিলাম, ও লেজারখানা কিসের দাদা?

পাপ-পুণ্যের হিসেব, শুধু আজকের দিনের।

উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, তা হ'লে আমার কথা অনেক কিছু আছে নিশ্চয়?

আছে বইকি।

একটু সলজ্জ হাসিয়া বলিলাম, মানে—ইয়ে—মানে, আজ আমার জন্মদিন কিনা, তাই।

দেবদূত মধুর হাস্যে বলিল, জন্মদিন?

না, শুধু জন্মদিন কেন? মৃত্যুদিনও তো বটে। বিষণ্ণ হইলাম। কিন্তু সে শুধু পলকের জন্য। বলিলাম, এণ্টিগুলো একটু দেখাবেন দাদা?

নিশ্চয়। এই দেখ না।

কিন্তু একি! এ যে শুধু কালির উপর কালি, সব কালি! প্রচণ্ড বিস্ময়ে বলিলাম, এ কেমন ক'রে হ'ল?

কিছুই তো হয় নি। ঠিকই আছে।

ঠিকই আছে? সারাদিন সৎ কাজ ক'রে মন খারাপ হ'ল, গা ব্যথা হয়ে গেল, পকেট খালি হ'ল, সে সব খরচের পাতায়? আবার বলছেন, ঠিকই আছে!

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আনা আষ্টেক পয়সা জলে গেছে, গেছে। কিন্তু আজকে কতখানি স্বার্থত্যাগ ক'রে এলাম, সে সব কিছু নয়?

কি স্বার্থত্যাগ করেছ?

চটিয়া উঠিলাম। বলিলাম, মজা মন্দ নয়! যে মেয়েটার জন্যে তিন বছর চোখে ঘুম নেই, বলা নেই, কওয়া নেই, স্বকুমার হতভাগার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। আমি হাসিমুখে সব শুনে এলাম, নেমন্তন্নর চিঠি লিখে দিয়ে এলাম, কনেকে 'সুখী হও' ব'লে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত ক'রে এলাম। সব ভুয়ো?

ভুয়োই তো। কে বললে, স্বকুমারের হাতে সে সুখী হবে?

হবে না? অবাক হইয়া বলিলাম, বলেন কি মশায়, স্বকুমার সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে পায়, আর আমি মোটে—

শুধু ভুয়ো নয়, ভণ্ডামি। তুমি মেয়েটিকে কোন দিন মুখ ফুটে বলেছিলে যে ভালবাস?

বলি নাই; সুযোগ পাই নাই বলিয়া নহে, সাহস হয় নাই বলিয়া; আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে।

বলিলাম, না তো।

দেবদূত বলিল, দুর্ব্বলতা।—বলিয়া কলমটা বাহির করিয়া পাতাটার উপরে আরও খানিকটা কালি ছিটাইয়া দিল। আমি চুপ করিয়া দেখিলাম। বলার মত বিশেষ কিছু ছিল না।

দেবদূত এইবার বাগে পাইয়া বক্তৃতা স্বরু করিল। আমার স্বার্থত্যাগের যে মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা শুনিলে ফ্রয়েড, ইউং ও অ্যাড্‌লার যুগপৎ কানে আঙুল দিতেন। আমিও দিলাম। কাতর কণ্ঠে বলিলাম, থামুন মশায়, লেকৃচার শোনার দরকার নেই আমার। একটু চুপ করুন।

দেবদূত চুপ করিল।

অর্থাৎ আজ সারাদিন ধরিয়া যাহা করিয়াছি, সব মিলিয়া আমাকে নরকের পথে ঠেলিয়াছে। শুধু একদিনের হিসাবে মামলার নিষ্পত্তি

হয় কি করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মহাশূন্যে আমাদের গতিবেগ বাড়িয়া চলিল।

পরীক্ষায় ফেল করা অনিবার্য্য জানিয়া পরীক্ষার্থী যেমন যাহা খুশি করিয়া যায়, আমারও অনেকটা সেই রকম হইল। বলিলাম, যা হবার তা তো হ'ল। আর কতদূর ?

দেবদূত বলিল, কি কতদূর ?

নরক—হেল—জাহান্নাম—ইন্‌ফার্‌নো।

দেবদূত বলিল, থাক, আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। কিন্তু তুমি নরকে যাচ্ছ কে বললে ?

তবে কোন্ চুলোয় যাচ্ছি ?

দেবদূত বলিল, ছি। চুলো বলতে নেই। তুমি স্বর্গে যাচ্ছ।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি দাদা ? পুণ্যির ঘরে তো শূন্যি ?

এই দেখ।

সে একখানা পাতা আমার সামনে মেলিয়া ধরিল। বিচিত্র মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণাক্ষর চোখ ঝলসাইয়া দিল। দেখিলাম, জমার ঘর শূন্য নহে, সেখানে সগৌরবে রহিয়াছে আমার নিভৃত মনের একটি ক্ষুদ্রতম বেদনা, একটি ভিখারীকে পয়সা দিতে গিয়া দেখিয়াছিলাম পকেট শূন্য, শুধু সেই লজ্জাটুকু।

দুই রাত্রির ইতিহাস

স্টেশন বাংলা দেশেই বটে, কিন্তু গ্রাম বিহারে।

অবশ্য ঐ এক স্টেশনে নামিয়া পুরা ছয়খানা গ্রামের লোক বাড়ি যায়, তাহাদের মধ্যে দুইখানি মাত্র বাংলায়, বাকি বিহারে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই ; সে সব গ্রামে যাহারা থাকে, তাহারা দেখিতে শুনিতে সব দিক দিয়া বাঙালী।

ছোট স্টেশন। প্ল্যাট্‌ফর্ম নাই, ছোট একখানা ঘর—স্টেশনের আপিস, বুকিং-ঘর, স্টেশন-মাস্টার ও পোর্টারের দিবানিদ্রার কক্ষ, একাধারে সবই।

কতদিন পরে বিজন এই স্টেশনে পা দিল! নয়-দশ—না নয়-দশ কেন—প্রায় বারো বছরের কথা, ম্যাট্রিক দিয়া এ গ্রাম ছাড়িয়াছিল, আর তাহার পরে এ গ্রামে ফিরে নাই। বিজন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। বারো বছরে খুব বেশি পরিবর্ত্তন হয় নাই। এমন কি স্টেশনের বাহিরে যে ঢালু রাস্তা নামিয়া গিয়াছে, তাহার পাশের খেজুরগাছটি, আর গজ-কয়েক দূরে ছোট্ট কাঠের সাঁকোর ধারে খালের উপর হেলিয়া পড়া অশ্বত্থ-গাছ, সব ঠিক তেমনই রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে চোখে পড়িল স্টেশনের বাহিরে একটি দোকান, যেখানে চিনির তৈরি সন্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পান, বিড়ি, এমন কি গোটা-দুই-তিন মরিচা-ধরা টর্চ-লাইট পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায়।

এ স্টেশনে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়া যাহারা আসে, স্টেশন-মাস্টারের অপরিচিত তাহারা কেহই নহে। কিন্তু এ লোকটিকে তাঁহার চেনা মনে হইল না। একটু সন্দিগ্ধ, অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, মশায়ের নিবাস? এ ধরনের প্রশ্ন পল্লীগ্রামের কেহ অসঙ্গত মনে করে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক রাস্তায় দাঁড় করাইয়া নামধাম, জাতি, 'ঠাকুরে'র নাম, পিতামহের নাম জানিয়া লইবে। নিজের ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের নাম, ব্যবসা, জমিজমা সকল খবর দিবে—ইহাতে পল্লীগ্রামে অবাক বা বিরক্ত হইবার কিছু কেহ খুঁজিয়া পায় না। বারো বছর পরে প্রায় নূতন অভিজ্ঞতা হইলেও বিজন বিরক্ত হইল না। মৃদু হাসিয়া কহিল, এইখানেই।

এইখানে তো অন্তত ছখানা গাঁ আছে মশায়, মুকুন্দপুর, মধুখালি—

আমার নিবাস শিমুলডাঙা।

শিমুলডাঙা? সে কি মশায়, শিমুলডাঙার প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনি, মায় বেড়ালটা পর্য্যন্ত; কিন্তু আপনাকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না তো! বোধ হয় সম্প্রতি আর এদিকে—? প্রশ্ন সম্পূর্ণ না হইতেই বিজন জবাব দিল, না, সম্প্রতি তো নয়ই, বারো বছর আন্দাজ এদিকে আসি নি।

স্টেশন-মাস্টারের চোখ স্থানচ্যুত হইয়া ললাটে গিয়া পৌছিল। হয়তো আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু বিজন গ্রামের দূরত্বের দোহাই দিয়া বিদায় লইল।

বাহিরে একটি লোক এতক্ষণ ধরিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। বিজন বাহিরে পা বাড়াইতেই নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুর গোগাড়ি চাই না?

গোগাড়ি! বিজনের বিষম হাসি পাইয়া গেল। ঠিক তো; এদেশের লোকের কথা ঠিক যে কলিকাতার মত নহে, সে কথা বিজন এতক্ষণ খেয়াল করে নাই কেন? কিন্তু গাড়ি একটা হইলে মন্দ হইত না—প্রায় সাত মাইল রাস্তা। সাত মাইল! বারো বছর আগের দিনগুলি মনে

হইলে অবাক হইতে হয়। ছুটির দিনে কতবার সে দলবলসহ এই সাত মাইল রাস্তা অক্লেশে পার হইয়া আসিয়া প্রায় তেমনই অক্লেশে ফিরিয়া গিয়াছে। আজ সেই রাস্তার জন্য গাড়ি! কিন্তু রাস্তা না হয় হাঁটিয়াই চলিল; স্যুটকেসটারও তো একটা ওজন আছে! একটা লোক দরকার বোধ করিয়া গোগাড়ির মালিককেই ব্যাগের বাহক ঠিক করিয়া বিজন গ্রামের দিকে হাঁটিতে সুরু করিল।

কিন্তু একটা সুবিধা স্বীকার করিতেই হইবে। স্টেশন হইতে শিমুলডাঙা একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, দুই পাশে মেঠো রাস্তা, বুনো রাস্তার শাখা রহিয়াছে, কিন্তু পথ ভুল হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। হাজার হোক বারো বৎসর তো! বিজন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কারণ ঐ সঙ্গের লোকটি যে ভাবে হাঁটিতেছে, তাহার সহিত চলিতে গেলে রাত নয়টা বাজিয়া যাইবে। বিজন জোরে পা ফেলিয়া চলিল।

ষোল বছরের কিশোর যে গ্রাম ছাড়িয়াছিল, আজ আটাশ বছরের যুবকরূপে সেই দিকে চলিতে বিজনের অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। এই রাস্তা, এই আশপাশে বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়া, জিওলগাছের বনের পাশ দিয়া বাঁশ-পাতায়-ঢাকা যে সব সরু সরু পথ চলিয়া গিয়াছে, চোখ বুজিয়া তাহার প্রত্যেকটি অনুসরণ করিয়া সে যে কোন গ্রামে পৌছিতে পারে—মুকুন্দপুর, তিলেডাঙা, মধুখালি, আরও কত।

মৃদু বৈকালিক রৌদ্রের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কত কথাই না মনে আসে! সে কি দিনই গিয়াছে! রোদবৃষ্টির মধ্যে অবাধে ফুট্‌বল খেলা, বৃষ্টিতে গ্রামের অকিঞ্চিৎকর পাহাড়ে নদী যখন ফুলিয়া উঠে তখন তাহাতে সাঁতার কাটা, বাজি ধরিয়া পনরো বার দীঘি পার হওয়া।

সেই দীঘির সহিতই কি কম স্মৃতি জড়াইয়া আছে! অমন স্বচ্ছ জল এ অঞ্চলে কোনও পুকুরে ছিল না। পাশের গ্রামের ছেলেরা দীঘি

দেখিয়া ঈর্ষায় মরিত। তাহাদের গ্রামে যাহা আছে তাহা দীঘি নয়, পুকুর, তাহা এত বড় নয়, তাহার জল এমন কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ কালো নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা পাড়াগেঁয়ে ছেলের কাছে—কোনটিতে এর শতাংশের একাংশও মাছ নাই। ছিপ লইয়া বিকালে আসিয়া বসিয়া পড়, সন্ধ্যার আগে খালুই ভর্ত্তি করিয়া লইয়া যাও—এত আরাম আর কোন্ গ্রামের কোন্ পুকুরে আছে?

আর পদ্মদীঘি? আকৃতিতে ছোট, কিন্তু এত পদ্ম যে এক পুকুরে ফুটিতে পারে, না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিত না। সারা পুকুর ভরিয়া ফিকে সবুজরঙের পাতা, তাহাদের মাঝে লালচে বড় বড় পদ্ম, আর প্রায় তেমনই বড় বড় কুঁড়ি। পদ্মপাতার উপর বৃষ্টির জল পড়িলে যেন মুক্তার মত টলটল করে।

কিন্তু এ সবই বারো বছর আগেকার কথা। হয়তো আজ দীঘি মজিয়া গিয়াছে, শান-বাঁধানো ঘাট ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে; হয়তো পদ্মদীঘির পদ্মের পরিবর্ত্তে আছে শুধু পানায় রাশি, পদ্ম কোথায় গিয়াছে কে জানে!

আকাশ কি সেই এক যুগ আগের মত গাঢ় নীল আছে? সেই নীল আকাশের গায়ে শরতের সাদা মেঘের খেলা তেমনই মনোরম রহিয়াছে?

হয়তো আছে। কিন্তু যোল বছরের কিশোর সে সব যে চোখে দেখিয়াছিল, আটাশ বছরের যুবক—যাহার দিন কাটিয়াছে কলিকাতার ইট-কাঠ, লোহা-লক্কড় আর ট্রাম-মোটরের ঘড়ঘড়ানির মধ্যে, সে কি আর এসব সেই চোখে দেখিতে পাইবে?

সাত মাইল রাস্তা ফুরাইয়া আসিল। পথের দুই ধারে ধানক্ষেত আর জঙ্গল, জঙ্গল আর ধানক্ষেত। সেই আগেকার দৃশ্য; পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা আছে, তাহা সহসা চোখে পড়ে না।

গ্রামে যখন পৌঁছিল, তখন সূর্য্যের শেষ রশ্মি মিলাইয়া গিয়াছে। স্যুট্‌কেস লইয়া লোকটা কখন আসিবে, কে জানে! ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, দম দেওয়া হয় নাই, তিনটা বাজিয়া ঘড়ি থামিয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলে মনে হয় প্রায় সাড়ে ছয়টা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার আকাশ আর গ্রামের আকাশ এক নয়।

ছোট একটা মাঠের মধ্য দিয়া ক্ষীণ একটি পথ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে ছোট্ট একটি খড়ের বাড়ি। বিজন বাড়ির দরজার শিকল ধরিয়া বার-কয়েক নাড়া দিল।

যে লোকটি আসিয়া দরজা খুলিল, তাহার বয়স প্রথম দৃষ্টিতে তেত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে যে কোনটা হইতে পারে। কিন্তু আসলে সে বিজনেরই সমবয়সী। আধ-ময়লা কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো, মুখে তিন-চারদিনের সঞ্চিত দাড়ি; আর বেশ বড় গোছের এক জোড়া গোঁফ। বাঁ পাখানি রোগা এবং বেশ একটু বাঁকা। রং এককালে হয়তো ফরসাই ছিল, এখন ঘনশ্যাম।

বাহির হইতে যে লোকটি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে সে চিনিতে পারিল না। পথের ধূলায় জুতা ও কাপড় রক্তিমাভা ধারণ করিলেও তাকাইলে বুঝা যায়, ধরনধারনে এতটা আভিজাত্য গ্রামের লোকের থাকিতে পারে না।

বিজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চান?

বিজন কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া ভিতরে আসিয়া বলিল, আমি বিজন।

বারো বছরের বিস্মৃতির ধোঁয়া কাটাইয়া উঠিতে অবিনাশের আর এক মুহূর্ত্তও লাগিল না। খোঁড়া পা লইয়া যতটা লাফানো যায় লাফাইয়া

কহিল, তুই বিজু? কতকাল পরে বল তো? তারপরে কি মনে ক'রে এই বেখাপ্পা গাঁয়ে? ব্যাপার কি?

প্রশ্নের সংখ্যা কিছু বেশি হইয়া গেল। বিজন কহিল, ভেতরে চল, সব বলছি। বাড়ির ভেতরে অন্য লোক নিশ্চয়ই আছে?—বলিয়া চোখ টিপিয়া হাসিল।

অন্য লোক অর্থে স্ত্রী একজন অবশ্যই ছিল। সেই সঙ্গে আরও গুটি তিনেক প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইল, যাহাদের বয়স দুই হইতে সাতের মধ্যে।

অবিনাশ চীৎকার করিয়া কহিল, প্রণাম কর, গড় হয়ে প্রণাম কর, তোদের বিজু কাকা। উঃ, কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা, কতকাল পরে! কতখানি যে চেহারার দিক দিয়ে বদলে গিছিস!

বিজনের সঙ্গে তাহার অনেককাল পরে দেখা হইয়াছে এইটাই যেন অবিনাশের চিত্ত অধিকার করিয়া ছিল। বিজন ততক্ষণে দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়াছে।

পা খোঁড়া হইলেও অবিনাশ লোকটি কিছু বেশি রকম ব্যস্তবাগীশ। চীৎকার করিয়া বলিল, ঐ মাটিতেই ব'সে পড়লি রে হতভাগা? চল, তোর বউদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভুলেই গিয়েছিলাম। ওগো, শুনছ? আমাদের বিজু এসেছে, কতকাল পরে। একবার বাইরে এস, আলাপ-আপ্যায়ন কর।

একটি শ্যামবর্ণা স্থশ্রী সপ্রতিভ মেয়ে, বয়স কুড়ির খুব বেশি উপরে নয়, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজন নমস্কার করিয়া কহিল, বউদি বলছি বটে, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, অবিনাশ আমার চেয়ে দিন-কয়েক কি মাস-খানেকের ছোটই হবে। কি বলিস অবিনাশ?

অবিনাশ সগর্জ্জনে প্রতিবাদ জানাইল।

বারো বছর বিচ্ছেদের পরে দুই বন্ধুর পরিচয় জমিয়া উঠিল।

বারো বছর আগে গ্রামের হাই-স্কুল হইতে দুইজনে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাহির হইয়াছিল। বিজন পাস করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল, অবিনাশ কি করিল সে খবর জানিল না।

এই দুইটি ছেলে যে গ্রাম ও স্কুলের রত্নবিশেষ, সে কথা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ এবং মাস্টারেরা সবাই স্বীকার করিতেন। লাস্ট ক্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুইজনে রেষারেষি করিয়া উপরের ক্লাসে উঠিয়াছে, কোন বারে বিজন ফার্স্ট হইয়াছে, কোন বারে অবিনাশ।

কিন্তু বিজন সেই সঙ্গে ছিল খেলার সর্দ্দার। ষোল বছরেই তাহার শরীর হইয়াছিল বিশ বছরের জোয়ানের মত লম্বা-চওড়া, তাহার ফুটবল-খেলা লইয়া লোকে সগর্ব্বে পাশের গাঁয়ের লোকদের সহিত ঝগড়া করিত।

আর অবিনাশ ছিল ক্ষীণদেহ, তাহার উপর আবার একটা পা খোঁড়া। স্কুল-গৃহের বাহিরে তাই তাহার প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল না। কিন্তু ক্লাসের ভিতরে সে কাহারও চেয়ে ছোট ছিল না। বিজন ইংরেজী একটু বেশি ভাল জানিত, সে অঙ্কে সে অভাব পুরাইয়াছিল। দুইজনের মধ্যে আবাল্য প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু আশৈশব বন্ধু।

কিন্তু সেই যে বারো বৎসর আগে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, তাহার পর আর কেহ কাহারও খোঁজ লয় নাই।

তাহার পর অবিনাশের পিতৃবিয়োগে তাহার জীবনে যেন একটা ওলটপালট ঘটাইয়া দিয়া গেল। কেমন করিয়া যে কি হইল, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া মনে করিতে পারে না। বছর দুই-তিন কি করিয়া কাটিল, তাহা সেই জানে। দয়ার্দ্র প্রতিবেশীদের নিকট নানা রকম সাহায্য পাইয়া, কিছুদিন ছোট ছেলেদের অ-আ-ক-খ শিখাইয়া কোন রকমে দিন

চলিল। তাহার পরে গ্রামের স্কুলে নিম্নশ্রেণীর মাস্টারি জুটিয়া গেল, বেতন পঁচিশ টাকা।

অভাবের মধ্য দিয়াই দিন কাটে। যখন বয়স প্রায় কুড়ি, সেই সময় বৃদ্ধা মাতা আর পৌত্রমুখ দেখার লোভ সামলাইতে না পারিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া ফেলিলেন।

খোঁড়া ছেলে! তা হোক। পুরুষের তাহাতে বিবাহ আটকায় না। কাছেই এক গাঁয়ে এক গরিবের ঘরের একটি শ্যামলা চতুর্দ্দশী মেয়ে এক জ্যোৎস্না-রাত্রে খোঁড়া স্বামীর ঘর করিতে আসিল।

মার কিন্তু আর পৌত্রমুখ দেখা হইল না। শিবানী আসিবার মাস-কয়েক পরে ছেলে-বউয়ের হাতে সংসারের ভার দিয়া তিনি এপারের মায়া কাটাইলেন।

তাহার পরে আট বছর কাটিয়াছে।

নিজের ইতিহাস শেষ করিয়া অবিনাশ খানিক দম লইয়া কহিল, তারপরে তোর কি খবর শুনি?

বিজন সহসা কোনও উত্তর দিল না। একটু থামিয়া কহিল, খুব বেশি কিছু নয়। বি. এস-সি. পাস করেছিলাম। তারপরে টাকার অভাবে পড়া হ'ল না।

কেন, তোর বাবা?

বিজন সংক্ষেপে কহিল, নেই।

তাহার পরে আরও খানিকটা সব চুপচাপ। আবার বিজন আরম্ভ করিল। বাবা রেখে তো কিছু যানই নি, উপরন্তু বেশ কিছু দেনা রেখে গিয়েছিলেন। সেটা শোধ করতে কলকাতার বাড়িখানা গেল। চার বছর ধ'রে না করেছি এমন কাজ নেই, খবরের কাগজ বিক্রি পর্য্যন্ত। একটা কেরানীগিরি পেয়েছিলাম, রাখতে পারলাম না।

কেন?

সাহেবের নাক দিয়ে রক্ত বার ক'রে দিয়েছিলাম।

দুইজনে প্রাণ ভরিয়া হাসিল।

এখন কি করছিস?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিজন জবাব দিল, একটা সেল্‌স্‌ম্যানের চাকরি পেয়েছি। বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতে হয়। মধ্যে মধ্যে বাইরে পাঠায়। তেমনই এক সুযোগে তোর এখানে এসে পড়েছি। স্টেশনের নাম দেখে আর ব'সে থাকতে পারলাম না।

কত দেয়?

তিরিশ। তা ছাড়া টাকায় দু পয়সা কমিশন। তাতে আরও গোটা কুড়িক টাকা হয়।

মোটে পঞ্চাশ? কলকাতায় চালাস কি ক'রে?

তুই এখানে তোর পঁচিশ টাকায় যেমন ক'রে চালাস।

আমার কথা ছেড়ে দে। এ পাড়াগাঁ, জিনিসপত্র সস্তা। বাড়ির বাগানে তরিতরকারি যথেষ্ট হয়; আমার বেশ চ'লে যায়। তা ছাড়া, অবিনাশ একটু হাসিয়া কহিল, আমার কষ্ট ক'রে থাকা চিরকালের অভ্যেস; তোর তো তা নয়।

নয় সত্যি। অভ্যেস করতে হয়েছে।

নিজের ছোট মেয়েটির দিকে তাকাইয়া অবিনাশের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে করেছিস তো? না আইবুড়ো কার্তিক?

হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিয়া বিজন কহিল, করেছি তো একটা।

শুধু পাড়াগাঁয়ের লোক যেমন করিয়া হাসিতে পারে তেমনই করিয়া

হাসিয়া অবিনাশ কহিল, মোটে? আমি বলি বা এক গণ্ডা দেড় গণ্ডা হবে। তারপরে ছেলেপিলে?

উঁহু।

বিয়ে করেছিস কতদিন?

তা প্রায় বছর-দেড়েক হবে।

এতক্ষণে অবিনাশ যেন একটু ঈর্ষা অনুভব করিল। সে বিবাহ করিয়াছে আজ আট বছর, তাহার মধ্যে চারটি ছেলে মেয়ে জন্মিয়াছে, একটি মারা গিয়াছে, আটাশ বছর বয়সে পুত্রশোকও বাদ যায় নাই।

শিবানী মেয়েটি চমৎকার।

মোটে তো একুশ-বাইশ বছর বয়স। তাহার মধ্যেই এমন গিন্নী হইয়া উঠিয়াছে যে, বিজন না হাসিয়া পারিল না। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অতিরিক্ত লজ্জার অহেতুকী জড়সড় ভাব না থাকিলেও এমন একটা ব্রীড়াবনত ভাব আছে, যাহা দিয়া শহরের মেয়ে ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তফাত চেনা যায়। শিবানীকে বিজনের ভারী ভাল লাগিল।

বিজন কহিল, তুই ভাগ্যবান।

অর্থ?

লক্ষ্মীর মত বউ পেয়েছিস।

অবিনাশ শিবানীর লজ্জানত দেহের দিকে তাকাইয়া বলিল, যা বলেছিস। দেখ, নিজের ইয়ে ব'লে বলছি না—এই আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়ের জাতই আলাদা। আর শহরের মেয়ে—অবিনাশ ভাত-মাখা ডান হাত আর বাঁ হাত সামান্য তফাতে রাখিয়া জোড় করিয়া প্রায় কপালে ঠেকাইল—ক্ষুরে নমস্কার।

শহরের মেয়ে কিন্তু অবিনাশ খুব বেশি দেখে নাই। মোটে দেখিয়াছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ।

বিজন মনে মনে হাসিল। প্রকাশ্যে কহিল, ঠিক বলেছিস।

অবিনাশ বিনা কারণে গলার স্বর নামাইয়া কহিল, হ্যাঁরে, তোর বউ কেমন? নাম কি?

বিজন শিবানীকে শুনাইয়া কহিল, লীলা। আর কেমন মেয়ে যদি জিজ্ঞাসা করিস তো বলব শহরের মেয়ে যেমন হয়ে থাকে।

সুন্দরী?

মন্দ না। তবে—এইবার বিজন চুপিচুপি কহিল, সেসব মেয়ের চাইতে তোর বউ লাখোগুণে ভাল। তোকে ঠাট্টা ক'রে ভাগ্যবান বলি নি।

অবিনাশ তৃপ্তির হাসি হাসিল। কিন্তু মনে মনে কোথায় যেন একটু বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বিজন লীলাকে পাইয়া সুখী হয় নাই। হয়তো বউয়ের মেজাজ কড়া। হয়তো বা বেলা আটটা পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া থাকে, আর বিজনকে স্বহস্তে বিছানায় চা পৌঁছাইয়া দিতে হয়। ভাবিতেও অবিনাশ শিহরিয়া উঠিল। শিবানী যদি তেমন হইত?

কিন্তু শিবানী সে রকম মেয়েই নয়। সেই সাতসকালে উঠিয়া ঘর লেপা, উঠান ঝাঁট দেওয়া, গোয়াল মুক্ত করা, এমনই সব হাজার রকমের কাজ। তাহার উপর ছেলেমেয়েগুলি বড় দুরন্ত; তাহাদের সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়া সে হাসিমুখে ঘরের কাজ করিয়া চলিয়াছে। স্বামীর খোঁড়া পা লইয়া দুঃখ করিতে কেহ তাহাকে দেখে নাই। অমন সুশ্রী মেয়ে, হইলই বা রং একটু ময়লা; কপাল খারাপ বলিয়াই না দরিদ্র খোঁড়া স্বামীর ঘরে পড়িয়াছে! কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, যেন কোন্ ভাগ্যবানের ঘরের বধূ!

সে রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা দাওয়ায় এক মাদুরে পাশাপাশি শুইয়াছিই

বন্ধু রাত প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল। তাহাদের চিরদিনের সুখসম্পদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, সব একে একে বায়স্কোপের ছবির মত দুইজনের মনের পর্দ্দায় ছায়া ফেলিয়া চলিল। সেই যখনকার কথা ভাল করিয়া মনেও পড়ে না, যখন প্রথম বিজনের বাবা এ গাঁয়ে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন, সে কি আজকের কথা! প্রায় তেইশ বছর তাহার পরে কাটিয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঐ পদ্মদীঘির ধার দিয়া ধানক্ষেতের আল বাহিয়া তাহারা একসঙ্গে গ্রামের প্রান্তে স্কুলে গিয়াছে, যখন ফিরিয়াছে তখন সূর্য্য পশ্চিম-গগনের এক কোণে রঙিন মেঘের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন।

অবিনাশ হাসিয়া কহিল, জানিস বিজু, মনে মনে কতবার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে হুকুম চালিয়েছি; খোঁড়া পা ভাল হয়ে গিয়েছে, সকলের সঙ্গে মাঠে ছুটোছুটি ক'রে ফুট্‌বল খেলেছি।

আর আমি মনে মনে এরোপ্লেনে চ'ড়ে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছি, আট্‌লাণ্টিকের ঝড়ের মধ্যে জাহাজে ক'রে পাড়ি দিয়েছি। কল্পনার ওপরে তো কোন ট্যাক্স নেই।

ভাগ্যিস নেই; নইলে এত দিন আমি দেউলে।

উঠানের পাশে একটা গাছে সারারাত ধরিয়া ঝিঁঝি ডাকিয়া চলিল, ঠিক যেমন করিয়া ডাকিত বারো বছর আগে। এই বারো বছর অবিনাশ এইখানে কাটাইয়াছে, কই, একদিনের জন্যও তো তাহার ছেলেবেলার দিনগুলির কথা তেমন করিয়া মনে পড়ে নাই! আর আজ বিজু আসিয়া এই দরিদ্র অর্দ্ধশিক্ষিত স্কুল-মাস্টারের মনের কোন্ গোপন তন্ত্রীতে কি রাগিণী বাজাইয়া দিয়া গেল, যাহাতে লুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি বারো বছরের বিস্মরণের সেতুহীন নদী পার হইয়া আসিয়া হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে!

বিজন জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ভিটেটার কি অবস্থা রে ?

আসার পথে দেখিস নি ? আর দেখলেই বা চিনবি কি ক'রে ? সে তো এখন বাবলা-বন। সেই যে দেশ ছাড়লি, আর তো এমুখো হলি না !

বিজন কথা বলিল না।

সকালে যখন বিজনের ঘুম ভাঙিল, তখন রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া বিজন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সুনিপুণ গৃহস্থালী দারিদ্র্যের সকল চিহ্ন ঢাকিতে পারে নাই। কিন্তু ম্যাট্রিক পাস খোঁড়া স্কুল-মাস্টারের ইহার চাইতে ভাল লক্ষ্মীশ্রীর দাবি কিছু থাকিতে পারে না।

সেদিন রবিবার। বিজনকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশ গ্রাম দেখাইতে বাহির হইল। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত অনেকের সহিত আলাপ সমাধা করিয়া যখন ফিরিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

অবিনাশ বলিতেছিল, আমাদের হেড-মাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব বিজু, দেখিস, কি রকম জ্ঞানী লোক। বি. এ. পাস, বছর চল্লিশ বয়েস হবে, কিন্তু বিদ্যের গাছপাথর নেই। আলাপ ক'রে খুশি হবি।

বিজন অন্যমনস্কভাবে বলিল, আচ্ছা।

সারাজীবন যে স্কুল-মাস্টার অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন কাটাইয়া গেল, বি. এ. পাস হেড-মাস্টার যে তাহার কাছে জ্ঞান ও বিদ্যার আদর্শ হইবে, তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই।

আহারাদি শেষ করিয়া উঠিতে দুপুর গড়াইয়া গেল।

বিকালের দিকে বিজন কহিল, হ্যাঁরে, নদীর ওপারে সেই যে সাঁওতালদের কি একটা গাঁ আছে না, নাম ভুলে যাচ্ছি ?

লক্ষ্মীপুর।

হ্যাঁ, লক্ষ্মীপুর। এখনও তেমনই আগের মত ফিটফাট পুতুলের বাড়ি আছে?

চল না, ঘুরে আসা যাক।

তোর কষ্ট হবে না তো?

খোঁড়া পায়ের কথা ভাবছিস? এই পা নিয়ে পাহাড়ে উঠেছি, জানিস? পাহাড় মানে প্রায় চারতলা-সমান উঁচু একটা মাটি ও পাথরের ঢিবি।

তবে চল।

ছোট্ট পাহাড়ে নদী। এখন জল নাই বলিলেই হয়। অনেকখানি বালির চর পার হইয়া কোন রকমে পায়ের গোড়ালি ভিজানো যায় এমন নদী। কিন্তু কি পরিষ্কার জল! তলার ছোট পাথরের টুকরাগুলিই বা কি সুন্দর! আশপাশে বালির উপর গর্ত্ত খুঁড়িয়া কাহারা যেন খাবার জল লইয়া গিয়াছে।

এ সবই ছেলেবেলার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। নদীর ওপারে আবার দীর্ঘ বালির চর। কতদিন নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া সেই যে ঝিঁঝি-পোকার মত দেখিতে, বালির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া থাকে, তাহাদের গোটাকতক বাহির করিয়া লড়াই বাধাইয়া মজা দেখিয়াছে। এদেশের লোকে বলিত, মেড়হার লড়হাই।

সমস্ত সেদিনের কথা বলিয়া মনে হয়।

ছবির মত তকতকে ঝকঝকে ছোট ছোট বাড়ি, খেলাঘরের পুকুরের মত গোটা-তিন-চার পুকুর, এই লইয়া সাঁওতালদের গ্রাম। দুটি জিনিস বিজনের চোখে নূতন ঠেকিল, সেটি মিশনারীদের বাংলো, আর ছোট্ট একটি মিশনারী স্কুল।

রাত্রে বিজন কহিল, অবিনাশ, কাল তো যেতে হয়।

অবিনাশ যেন কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কহিল, যেতে হয়? তার মানে?

মানে, আর তো কাজ কামাই করা চলে না।

ক্ষেপেছিস, এর মধ্যে কি যাবি? যেতে দিলাম আর কি!

কিন্তু বুঝিতে হইল সবই। তবুও বিজনকে ছাড়িয়া দিতে অবিনাশের মন সরিতেছিল না। মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, বুঝি রে সব, কিন্তু বারো বছর বাদে এমনই হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা, তারপরে এত সহজে ছেড়ে দিই কি ক'রে বল তো?

ফলে বিজনকে আর একদিন থাকিতেই হইল।

বারো বছরের বিচ্ছেদের সমস্ত ক্লেশ তাহারা একদিনে শেষ করিতে চাহিতেছিল। আরও একটা দিন কাটিল গল্প করিয়া, রাত কাটিল রাত জাগিয়া।

বেলা এগারোটায় গাড়ি।

গরুর গাড়িতে যাইতে হইলে আটটার মধ্যে যাওয়া দরকার। হাঁটিয়া গেলে পরে যাওয়া চলে। বিজন হাঁটিয়া যাওয়া স্থির করিল।

বিচ্ছেদের আশঙ্কা যখন দুই বন্ধুর চোখ অশ্রুসজল করিয়া তুলিয়াছে, তখন বিজন অবিনাশকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

অপরাধীর কণ্ঠে কহিল, একটা কথা বলব অবিনাশ, কিছু মনে করিস নি।

কি?

অবিনাশ, আমরা দুজনেই গরিব, সে কথাটা তো তুই ভাল ক'রেই জানিস?

অবিনাশ একটু অবাক হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কথা কেন?

আচ্ছা, আমি যদি ধনী হতাম, তা হ'লে তুই কি আমার সঙ্গে ঠিক এমনই ক'রে মিশতে পারতিস ?

কথাটা অবিনাশ অস্বীকার করিতে পারিল না। কহিল, কি জানি !

কি জানি নয়, আমি জানি, তা হ'লে তুই ব্যবধান রেখে চলতিস। কিন্তু আমরা যখন দুজনেই প্রায় সমান গরিব, তখন—তখন আমি যদি তোর ছেলেমেয়েদের কিছু সন্দেশ খেতে দিই, তুই নিশ্চয়ই আপত্তি করবি না ?

আপত্তি অবিনাশ করিল এবং প্রবলভাবেই করিল।

কিন্তু বিজন ছাড়িল না। কহিল, শোন অবিনাশ, যদি আমি ধনী হতাম আর তোর ছেলেমেয়েদের এই নোটখানা দিতাম, তুই সেটা দয়ার দান ব'লে নিতে দ্বিধা করতে পারতিস। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ শুধু তোর ছেলেমেয়েদের কাকার উপহার। আমার ছেলেমেয়েদের তুই যদি এটা দিতিস, আমি নিতাম।

অবশেষে অবিনাশকে লইতেই হইল। একবার শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, কিন্তু তোরও তো টাকার অভাব, এটা থাকলে তোর কত সুবিধে হ'ত ভেবে দেখ তো।

হ'ত। কিন্তু আমার নিজের রোজগারের টাকা থেকে তোর ছেলেমেয়েদের উপহার দিতে পারছি, এ আনন্দটুকু থেকে আমার বঞ্চিত করিস নি। আমি দ্বিগুণ খেটে আবার ওটা রোজগার করতে পারব।

দরজার বাহিরে শিবানী চোখ মুছিল।

খোঁড়া অবিনাশের স্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না। তা ছাড়া তাহার স্কুল। শুধু যত দূর দেখা গেল, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লীলা জানলার বাহিরে তাকাইয়া কহিল, বন্ধুকে অতগুলো মিথ্যে কথা ব'লে এলে?

অবিনাশের খড়ের ঘরের রিক্ততার সহিত নিজের সুসজ্জিত ঘরের আসবাব-পত্রের একটা তুলনা মনে মনে করিয়া লইয়া বিজন কহিল, হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন গাদা গাদা সত্যি কথা ব'লে যে পুণ্য সঞ্চয় করেছি, এই দু দিনের মিথ্যে কথার পুণ্য আমার তার চাইতে কম নয়।

বন্ধুকে মিথ্যে কথা ব'লে ভোলানো বুঝি যারপর নাই পুণ্যের কাজ?

এক্ষেত্রে তাই লীলা। আমরা দুজনে জীবন আরম্ভ করেছিলাম প্রায় একসঙ্গে। তারপর পরিণামে আমি সফল হয়েছি, আর সে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে তার নিষ্ফল জীবন সম্বল ক'রে প'ড়ে আছে। তুমি কি মনে কর, আমি জীবনে এত সুখী হয়েছি জানলে সে খুশি হ'ত? অবিনাশের জায়গায় নিজেকে বসালে দেখতে পাই, আমি অন্তত হতাম না।

বন্ধুকে অত হীন মনে কর কেন?

মোটেই না। শুধু মানুষকে মানুষ ব'লে চিনি। জান লীলা, আমাকে তারই মত অকৃতকার্য্য ভেবে সে দুঃখিত যতটুকু হয়েছে, আনন্দ পেয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি। সে আনন্দকে নীচ প্রবৃত্তির ফল ব'লে মনে ক'র না। সে খুশি হয়েছে, আমরা জীবন-পথে বেশি দূর পৃথক হয়ে যাই নি, তাই ভেবে।

কিন্তু তুমি তো তাকে নানা রকমে সাহায্য করতে পারতে; তোমার যখন টাকার অভাব নেই—

এইখানেই তুমি মানুষ চেন নি লীলা। সে গরিব বন্ধুর কাছ থেকে যে নোটখানা উপহার ব'লে নিঃসঙ্কোচে নিতে পেরেছে, ধনী বন্ধুর কাছ

থেকে মোটা রকমের একটা ভিক্ষা সে সে রকম ভাবে নিতে পারত না, কোনমতেই না।

খানিক চুপ করিয়া বিজন কহিল, কিন্তু দু দিনের জন্যে তার গরিব বন্ধু তাকে যতটা সুখী করতে পেরেছে, তার ধনী বন্ধু তার শতাংশের এক অংশও পারত না। আমাকে সে সমধর্ম্মী ভেবে আদর ক'রে নিয়েছে, আমি চিরদিন তার কাছে সেই ভাবেই থাকতে চাই।